হীরাঝিল
রোমেনা আফাজ

দস্যু বনহুর সিরিজ

হীরাঝিল-৬০

রোমেনা আফাজ

সালমা বুক ডিপো

৩৮/২,বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

দস্যু বনহুর

বনহুর প্রচণ্ড এক ঝটকায় যমদূত ও বলিষ্ঠ লোক দু'টির হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিলো; তারপর সরে দাঁড়ালো দ্রুতগতিতে।

বৃদ্ধা হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো ভূতলে। সঙ্গে সঙ্গে তার হাতের ছোরাখানা বিদ্ধ হলো বৃদ্ধার তলপেটে। একটা বিকট আর্তনাদ করে উঠলো সে। সেকি ভীষণ চিৎকার ধ্বনি! কানে তালা লেগে গেলো যেন সবার। ভূতলে পড়ে বৃদ্ধা ছট্‌ফট্‌ করতে লাগলো। রাঙা হয়ে উঠলো মেঝেটা। খানিকক্ষণ ছট্‌ফট্‌ করার পর একটা ঝাঁকুনি দিয়ে নীরব হয়ে গেলো ওর দেহটা।

বৃদ্ধার জীবনবায়ু হাওয়ায় মিশে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সেই বলিষ্ঠ লোক দু'জন ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো; একটিবার তারা ফিরেও তাকালো না।

ওপাশে পড়ে আছে সদ্য হত্যা করা একটি মৃতদেহ। বৃদ্ধা তার রক্ত পান করেছে শুধু, মাংস ভক্ষণ করার সুযোগ সে পায় নি। বনহুর একবার বৃদ্ধার মৃতদেহটার দিকে তাকিয়ে ফিরে তাকালো সাদা আলখেল্লায় ঢাকা যমদূতের দিকে।

যমদূত মুহূর্ত বিলম্ব না করে বৃদ্ধার দেহ থেকে ছোরাখামা তুলে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো বনহুরের উপর। ঠিক ঐ দণ্ডে একখানা ছোরা এসে বিদ্ধ হলো যমদূতের পিঠে। বনহুরের বুকে ছোরা বসিয়ে দেবার সুযোগ পেলো না যমদূত। আর্তনাদ করে ছোরা হাতেই ঢলে পড়লো বৃদ্ধার পাশে।

বনহুর ফিরে তাকালো, এ ছোরা এলো কোথা থেকে! তাকাবার সঙ্গে সঙ্গেই তার চোখ দুটো আনন্দে দীপ্ত হয়ে উঠলো–রহমান আর রামসিংকে দেখতে পেলো সে। ছোরা নিক্ষেপ করেছে রহমান।

ওরা বনহুরের পাশে এসে দাঁড়ালো।

রহমান দ্রুতহস্তে বনহুরের হাতের বাঁধন খুলে দিলো। তারপর বললো–সর্দার, সবাইকে খতম করেছি। আসুন আমার সঙ্গে।

বনহুর বললো–তোমরা কি করে এখানে এলে?

সব পরে বলছি সর্দার, আসুন।

দাঁড়াও। বনহুর একটানে যমদূতের মুখের আলখেল্লা সরিয়ে ফেললো।

সঙ্গে সঙ্গে রহমান ও রামসিং অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলো–এ যে গুলবাগ হোটেলের মালিক মিঃ প্রিন্স!

হাঁ, যমদূত সেই শয়তানই। আজ থেকে কয়েকদিন আগে আমি তাকে ইরান সাগরে নিক্ষেপ করে হত্যা করেছিলাম কিন্তু তার মৃত্যু হয়নি। সে

ইরান সাগর থেকে কোনো ক্রমে বেঁচে গিয়েছিলো এবং আমার পিছনে ধাওয়া করেছিলো। রহমান, ঐ যে ডাইনী বুড়ী দেখছো, ওটাও এই শয়তান যমদূতের এক সৃষ্টি। এই বৃদ্ধার দ্বারা সে নরহত্যা সাধন করেছে। একটু থেমে বললো বনহুর–দুটো শয়তান খতম হলো। প্রথম জাফর হুসাইন, দ্বিতীয় মিঃ প্রিন্স খান। জাফর হুসাইনের হীরাঝিল আর মিঃ প্রিন্সের হোটেল গুলবাগ। রহমান, রামসিং, আর এখানে বিলম্ব নয়; এবার আমি রওয়ানা দেবো হীরাঝিলে। হীরাঝিল থেকে বন্দী বাঙ্গালীদের উদ্ধার করে তারপর গুলবাগ...থাক, আর দেরী নয় চলো।

বনহুর, রহমান আর রামসিং চালাঘর থেকে বেরিয়ে আসে বাইরে। চালাঘরের মেঝেতে পড়ে থাকে নরখাদক বৃদ্ধা আর যমদূতের লাশ।

বনহুর বাইরে এসে বললো–রামসিং, নাসিমা ভাল আছে তো?

হাঁ সর্দার, নাসিমা ভাল আছে–বললো রামসিং।

এবার বনহুর রহমানকে লক্ষ্য করে বললো–কি করে তোমরা সুড়ঙ্গমধ্যে প্রবেশ করেছিলে রহমান?

সর্দার, সে এক অদ্ভুত কাণ্ড। ঐ দিন হঠাৎ আপনি আমার পাশ থেকে কোথায় যে উঠে গেলেন, আমি আর আপনাকে খুঁজে পেলাম না। অনেক চিৎকার করে ডাকলাম...সর্দার, সর্দার কোথায় আপনি কিন্তু কোনো সাড়া পেলাম না। মনে আমার ভীষণ আতঙ্ক জাগলো। ভাবলাম, শেষ পর্যন্ত সর্দারকে হারালাম। কান্দাই ফিরে গিয়ে কি জবাব দেবো মা মনি আর বউ রাণীদের কাছে, কি জবাব দেবো নূর আর জাভেদের কাছে। আপনাকে ফিরে পাবার জন্য আমি চালা ঘরের দরজায় ভীষণ আঘাত করলাম কিন্তু আশ্চর্য, চালাঘরের দরজা এতটুকু শিথিল হলো না।

তারপর কি করলে? বললো বনহুর।

রহমান জবাব দিলো–তারপর আর একটুও বিলম্ব না করে অন্ধকারেই ছুটতে শুরু করলাম। কোন্ দিকে চলছি জানি না; তবে আমার উদ্দেশ্য আমাদের সেই পোড়োবাড়ি, যেখানে গিয়ে রামসিং, কাওসার এদের সঙ্গে করে আনবো এবং সন্ধান চালাবো আপনার। সমস্ত রাত অবিরাম ছুটে

চলছি। অন্ধকারে বালুকারাশির মধ্যে কতবার যে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলাম তার ঠিক নেই। সমস্ত ক্লান্তি-অবসাদ ভুলে গেছি। পা আর চলছে না তবু এগুচ্ছি। একসময় ভোর হয়ে এলো। হঠাৎ সম্মুখে তাকিয়ে দেখি আমাদের সেই পোড়োবাড়িটার প্রায় কাছাকাছি এসে গেছি। খোদার কাছে শুকরিয়া করে নিলাম,. তারপর গন্তব্যস্থানে পৌঁছে রামসিং আর কাওসারকে সব খুলে বললাম। সব শুনে তারা অস্থির হয়ে পড়লো। কিছুক্ষণ আমাদের মধ্যে চললো সলা-পরামর্শ। তারপর হারুনকে মিস নাসিমার পাহারায় রেখে আমরা রওনা দিলাম। সর্দার, আশ্চর্য ব্যাপার, আমরা যখন নির্জন প্রান্তরে এগিয়ে চলেছি তখন একটা কুকুর আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো।

বনহুর বলে উঠলো–কুকুর!

হাঁ সর্দার আমরা যখন এগিয়ে চলেছি তখন হঠাৎ কোথা থেকে একটি বিরাট কুকুর এসে হাজির হলো। কুকুরটা প্রথমে আমাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে লেজ আর মুখ নাড়তে লাগলো। কিছু বুঝতে না পেরে আমরা কুকুরটাকে তাড়িয়ে দিতে গেলাম; কিন্তু কুকর কিছুতেই চলে গেলো না। সে আমাদের আগে আগে এগিয়ে চললো।

তারপর?

সর্দার, যে পথে কুকুর এগুতে লাগলো আমরাও সেই পথ অনুসরণ করলাম। আমরা বুঝতে পারলাম কুকুরটা আমাদের কিছু বলতে চায় বা এমন কোথাও নিয়ে যেতে চায় যেখানে গেলে আমরা উপকৃত হবো। কুকুটাকে অনুসরণ করে আমরা চলেছি। মনোভাব দেখি কুকুরটা আমাদের, কোথায় নিয়ে যেতে চায়।

হাঁ, তারপর?

তারপর ঠিক এই চালাঘরের পিছনে এসে থামলো কুকুরটা। পা দিয়ে সে মাটি আঁচড়াতে লাগলো। অবাক হয়ে দেখলাম সেখানে একটা ঢাকনা রয়েছে। রামসিং এবং আমি ঢাকনাটা তুলে ফেললাম। সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলো একটি সুড়ঙ্গমুখ।

হুঁ, বলো তারপর? বললো বনহুর, চোখে মুখে বিস্ময় ফুটে উঠেছে।

রহমান বলে চললো–আমরা সেই সুড়ঙ্গমধ্যে প্রবেশ করলাম। তখন আমরা ভুলে গেলাম ভয়-ভীতি সব কিছু। কিছুদূর এগুতেই আমরা শুনতে পেলাম মানুষের কণ্ঠস্বর। আমরা তখন দ্রুত এগুলাম, অল্পক্ষণেই আমরা ঠিক জায়গায় পৌঁছে গেলাম। সম্মুখে তাকিয়ে দেখি সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য।

নরশয়তান যমদূত উদ্যত ছোরা হাতে আপনার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছে। আমি মুহূর্ত বিলম্ব না করে আমার কোমরের বেল্ট থেকে ছোরাখানা খুলে নিয়ে যমদূতের পিঠ লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারলাম। সর্দার, তারপরের ঘটনা তো সব জানেন।

বনহুর বলে উঠলো—রহমান, তুমি ঠিক সময় পৌছতে সক্ষম হয়েছিলে বলে আমার জীবন রক্ষা পেলো; না হলে আমাকে মৃত্যুবরণ করতে হতো তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সে কুকুরটা গেলো কোথায় তাতো বললে না?

সর্দার, আমরা সুড়ঙ্গমধ্যে প্রবেশ করার সময় কুকুরটার কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিলাম। এখন স্মরণ হচ্ছে কুকুরটার কথা। সর্দার, কুকুরটা গেলো কোথায় তাতো জানি না।

রামসিং আর বনহুর চারদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলো কিন্তু কোথাও কুকুরটিকে দেখতে পেলো না। রামসিং বললো এবার-সর্দার, দুটো লোক আমাদের বাধা দিয়েছিলো।

রহমান বলে উঠলো-হাঁ সর্দার, সে কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, আমরা যখন সুড়ঙ্গমধ্যে প্রবেশ করেছি তখন দুজন বলিষ্ঠ লোক আমাদের পথে বাধা দেয়। আমরা দু'জন তাদের হত্যা করেছি।

বনহুর বলে উঠলো-সে লাশ দুটো কোথায়?

সেই সুড়ঙ্গমধ্যে পড়ে আছে। বললো রামসিং।

বনহুর বললো-চলো, আমি সুড়ঙ্গপথটা একবার দেখতে চাই। কিন্তু তার পূর্বে আমি পরীক্ষা করে দেখতে চাই চালাঘরটার দরজা। এতো ধাক্কার পরও কেন বাইরে থেকে খোলা যায়নি বা ভেঙ্গে পড়েনি।

হাঁ সর্দার, আমাদের মনেও এটা বড় নাড়া দিচ্ছে।

চলো, আগে ঘরের দরজাটা পরীক্ষা করে দেখি। বনহুর কথাটা বলে অগ্রসর হলো।

রামসিং আর রহমান তাকে অনুসরণ করলো। চালাঘরের ভিতরে প্রবেশ করেই বনহুর দরজা পরীক্ষা করে দেখতে লাগলো। হঠাৎ বনহুর হেসে উঠলো। তারপর বললো-এই দেখো...বনহুর পা দিয়ে দরজার ওপাশে একটা চাকতির উপর চাপ দিতেই দরজা বন্ধ হয়ে গেলো এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা লৌহপাত উঠে এলো নিচের দিক থেকে। বাইরে থেকে সে পাতখানা দেখা না গেলেও দরজার ভিতর অংশ মজবুতভাবে আটকে গেলো।

বনহুর বললো–এ জন্যই আমরা বাইরে থেকে দরজাটা কিছুতেই খুলতে পারিনি বা ভাঙ্গতে সক্ষম হইনি। পুনরায় বনহুর দরজার পাশে দ্বিতীয় চাকতির উপর চাপ দিলো; সঙ্গে সঙ্গে দরজার সম্মুখভাগ থেকে লৌহ পাতখানা সাঁ করে নিচে চলে গেলো। এবার বনহুর, রহমান আর রামসিং বেরিয়ে এলো বাইরে।

রহমান বললো–সর্দার, আমরা এবার সুড়ঙ্গমধ্যে ভাল করে দেখতে চাই, কারণ তখন আমাদের কোনো দিকে দেখবার বা তাকাবার সময় ছিলো না।

বনহুর বললো–ঠিক বলেছো চলো।

ওরা সবাই মিলে চালাঘরখানার পিছনে গেলো। সেই সুড়ঙ্গ মুখ, ঢাকনাটা খোলা অবস্থায় রয়েছে। এবার বনহুর প্রথমে প্রবেশ করলো, পরে রহমানও রামসিং সুড়ঙ্গমধ্যে ঢুকে পড়লো।

অল্প এগুতেই দেখলো পাশাপাশি পড়ে আছে দুটো মৃতদেহ। বনহুর দেখমাত্র চিনতে পারলো এই লোক দু'জনই সেই লোক, যারা তাকে পাহারা দিয়ে রেখেছিলো। বললো বনহুর–এ দু'টাকে খতম করে ভালই করেছো তোমরা।

বনহুর, রহমান, রামসিং এরা তিনজন সুড়ঙ্গপথে এগুচ্ছে। লক্ষ্য করে দেখছে চারিদিক।

রহমান বললো–সর্দার, একটা কথা এখনও আপনাকে বলা হয়নি।

রামসিংও মাথা চুলকাতে লাগলো।

বনহুর বললো–কি কথা বলো?

রহমান বললো–সর্দার, আমরা যখন সুড়ঙ্গমধ্যে প্রবেশ করেছিলাম তখন পিছনে তাকিয়ে দেখি কাওসার নেই।

কাওসার!

হাঁ, সেও আমাদের সঙ্গে আসছিলো।

সে কথা এতোক্ষণ বলোনি কেন?

বলিনি আপনি ব্যস্ত হয়ে পড়বেন।

তোমরা ঠিক বলছো; কাওসার এসেছিলো তোমাদের সঙ্গে?

হাঁ সর্দার।

তাহলে সে গেলো কোথায়?

আমরা সুড়ঙ্গমধ্যে প্রবেশ করার পর ভেবেছিলাম সেও আমাদের সঙ্গে অগ্রসর হচ্ছে। একটু পরই আমরা বুঝতে পারলাম কাওসার আমাদের সঙ্গে নেই কিন্তু তার সন্ধান করবার পূর্বেই শুনতে পেলাম আপনার কণ্ঠস্বর। আমরা ভুলে গেলাম তার কথা। দ্রুত এগিয়ে গেলাম সম্মুখে তারপর দেখলাম আপনাকে। সর্দার, কাওসার গেলো কোথায় আর কুকুরটাই বা গেলো কোথা!

বনহুর চিন্তিত কণ্ঠে বললো–আশ্চর্য বটে!

রামসিং বললো–সর্দার, চলুন আমরা সুড়ঙ্গ মধ্য থেকে বেরিয়ে কাওসারের সন্ধান করি।

ঠিক ঐ মুহূর্তে একটা শব্দ ভেসে এলো, মনে হচ্ছে কুকুরের গলার আওয়াজ।

রহমান বলে উঠলো–সর্দার, কুকুরের গলার আওয়াজ পাচ্ছি।

হাঁ, ঐ রকমই মনে হচ্ছে। বললো বনহুর।

রামসিং বললো–মনে হচ্ছে এ সেই কুকুরের কণ্ঠস্বর।

হাঁ, তাই হবে। চলো আমরা শব্দ লক্ষ্য করে চলি। বনহুর এগুলো।

রহমান আর রামসিং তাকে অনুসরণ করলো।

শব্দটা কোন্‌দিক থেকে আসছে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না তবু এগুচ্ছে তারা। কিছুদূর এগুতেই সুড়ঙ্গমুখ বন্ধ দেখতে পেলো। কিন্তু এখনও কুকুরের গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। যেন বহু দূর থেকে ভেসে আসছে আওয়াজটা।

বনহুর বললো–নিশ্চয়ই আরও কোনো পথ আছে। সুড়ঙ্গপথের এটাই শেষ নয়। বনহুর সুড়ঙ্গমধ্যে সন্ধান করে দেখতে লাগলো।

হঠাৎ এক জায়গায় একটি শিকল ঝুলছে দেখতে পেলো বনহুর। রহমান আর রামসিংকেও দেখালো। বনহুর বললো–এই যে শিকল ঝুলছে এটা কি পরীক্ষা করে দেখতে চাই। এতে বিপদও আসতে পারে, মৃত্যুও ঘটতে পারে......

বনহুর শিকল ধরে জোরে টান দিলে সঙ্গে সঙ্গে একটা বিস্ময়কর ঘটনা ঘটলো। একটা সুন্দর দরজা বেরিয়ে এলো। এবার কুকুরের গলার আওয়াজ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

বনহুরের চোখ দুটো আনন্দে দীপ্ত হয়ে উঠলো, বললো–এবার আমি পথের খোঁজ পেয়েছি। তোমরা এসো আমার সঙ্গে।

বনহুর সেই ঝুলন্ত শিকল বেয়ে উপরে উঠে গেলো। উপরে উঠে হাত বাড়ালো রহমানের দিকে। রহমান বনহুরের হাত ধরে উপরে এলে, পুনরায় রামসিংকে তুলে নিলো বনহুর।

সুন্দর আর একটি সুড়ঙ্গপথ।

এখানে তেমন অন্ধকার নেই, বেশ স্বচ্ছ আলো আসছে পৃথিবী থেকে। বনহুর বললো—এ পথ কোথায় গেছে কে জানে!

কুকুরের কণ্ঠস্বর আর শোনা যাচ্ছে না।

বনহুর, রহমান আর রামসিং চারদিকে লক্ষ্য রেখে এগুচ্ছে। সুড়ঙ্গ পথটা বেশ প্রশস্ত, কাজেই দাঁড়িয়ে চলতে পারছে তারা।

রহমান বললো—সর্দার, আবার কোনো বিপদ আসবে বলা যায় না।

হাঁ, ঠিকই বলেছো রহমান, প্রতি মুহূর্তে আমাদের বিপদ আসতে পাবে। তোমরা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকবে।

সর্দার, মৃত্যুভয়ে আমরা ভীত নই। শুধু আশংকা আপনার জন্য।

রহমানের কথা শুনে হাসলো বনহুর।

কিছুক্ষণ চলার পর একটা ঘড়ু ঘড়ু শব্দ কানে এলো তাদের। এটা কিসের শব্দ তারা বুঝতে পারলো না। বনহুর বললো—চুপ, খুব ধীরে ধীরে চলো তোমরা।

বনহুরের কথামত খুব আস্তে আস্তে এগুতে লাগলো রহমান আর রামসিং।

ক্রমেই যেন, স্বচ্ছ আলো মুছে গিয়ে ঝাপসা অন্ধকার লাগছে। আরও কিছুটা এগুতেই দেখতে পেলো তারা, এখানে এসে সুড়ঙ্গ মুখ সোজা নিচের দিকে নেমে গেছে। এখানে আলোটা তেমন স্পষ্ট নয়; কেমন যেন একটা ঝাপসা ভাব।

বনহুর বললো—শব্দটা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে সম্মুখে তাকিয়ে দেখলো, অদূরে একটি লোক বসে আছে, পাশে বসে একটি কুকুর হাঁপাচ্ছে। তারই নাক থেকে একটা ঘড়ু ঘড়ু আওয়াজ বের হচ্ছে।

রহমান আর রামসিং বলে উঠলো—ঐ সেই কুকুর।

বনহুর বললো—আর যে লোকটা দেখতে পাচ্ছো ঐ সেই কাওসার।

রহমান বলে উঠলো—সর্দার, তাই মনে হচ্ছে।

রামসিং আনন্দধ্বনি করে উঠলো—কাওসার!

কুকুরটার কানেই শব্দটা আগে এসে পৌঁছে। সে হঠাৎ ঘেউ ঘেউ করে উঠলো ভীষণভাবে।

কাওসার ছুটে আসে–সর্দার, আপনারা এসে গেছেন...বেঁচে আছেন......

বনহুর বললো–হাঁ কাওসার, বেঁচে আছি। তারপর, তুমি কি করে এখানে এলে?

সর্দার, সে এক আশ্চর্য কাহিনী।

সংক্ষেপে বলো–বললো বনহুর।

কাওসার বললো–রামসিং আর রহমান সুড়ঙ্গমধ্যে প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গে আমি সুড়ঙ্গমধ্যে প্রবেশ করতে যাচ্ছি ঠিক ঐ সময় কুকুর আমার কাপড় কামড়ে ধরলো। আমাকে কিছুতেই সুড়ঙ্গমধ্যে প্রবেশ করতে দিলো না।

তারপর? অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো বনহুর।

রহমান ও রামসিং-এর চোখেমুখেও বিস্ময়। ওরা শুনছে আশ্চর্য হয়ে সব কথা।

কাওসার বললো–আমি কুকুরটার সঙ্গে সরে এলাম সুড়ঙ্গ মুখ থেকে। কুকুর আমার কাপড় ধরে টেনে নিয়ে চলেছে। একটা ঝোপের পাশে গিয়ে কুকুর আমার কাপড়টা ছেড়ে দিলো। তারপর একটা গাছের গুঁড়ির পাশে গিয়ে পা দিয়ে আঁচড়াতে লাগলো। আমি গাছের গুঁড়িটার নিকটে গিয়ে ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখছি হঠাৎ নজরে পড়লো একটা গর্ত। গর্তটা গাছের ঠিক কোটর বলে মনে হলেও সেটা কোটর নয়–একটা সুড়ঙ্গমুখ।

তারপর কি করলে তুমি? বললো বনহুর।

কাওসার বলে চলেছে–আমি সেই সুড়ঙ্গপথে প্রবেশ করলাম। হাঁ আর একটা কথা, আমি সুড়ঙ্গমধ্যে প্রবেশ করবার পূর্বেই কুকুরটা প্রবেশ করেছিলো; কাজেই আমি মনে নানা দ্বন্দ্ব নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলাম। তারপর দেখতে পেলাম সুন্দর একটা পথ। সেই পথে কুকুরটা আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো। চলেছি তো চলেছি–কতদূর এগুনোর পর আমার পা যেন অবশ হয়ে এলো বিশেষ করে আপনার জন্য মনটা আমার অস্থির হয়ে উঠলো; আর এগুতে পারলাম না, বসে পড়লাম। কুকুরটাও বসে পড়লো, হয়তো ও বুঝতে পারলো আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। একসময় আমার চোখ দুটো আপনা আপনি বন্ধ হয়ে এলো, কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম খেয়াল নেই। হঠাৎ রামসিং-এর গলায় আমার নাম শুনে জেগে উঠে দেখি সর্দার আপনি......

বনহুর ফিরে তাকালো কুকুরটার দিকে।

কুকরটা সাধারণ কুকুর নয়–বিরাট দেহ; চোখ দুটোতে যেন আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে। মস্তবড় মুখটার মধ্যে বড় বড় ঝকঝকে ধরালো দাঁত। জিভটা সরু অথচ লাল টকটকে, বেরিয়ে এসেছে মুখের ভিতর থেকে বাইরে। বনহুর ওর দিকে তাকাতেই লেজ নাড়তে লাগলো, যেন সে কত পরিচিত।

কুকুরটা কাওসারের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিলো, মনে হলো যেন সে ওর মনিব।

বনহুর সরে এসে কুকুরটার মাথায় হাত বুলিয়ে বললো–এর জন্যই আমার জীবন রক্ষা পেয়েছে।

রহমান বলে উঠলো–হাঁ সর্দার, এই কুকুরটা যদি আমাদের পথের নির্দেশ না দিতো তাহলে আমারা ঠিক সময় পৌঁছতে সক্ষম হতাম না। আশ্চর্য এই কুকুরটার আচরণ।

সত্যি বলেছো রহমান, এ কুকুরটা শুধু আশ্চর্যকর নয়, এ আমাকে বিশেষভাবে ভাবিয়ে তুলেছে। কারণ কুকুরটা হঠাৎ কোথা থেকে আবির্ভূত হলো আর তোমাদের সে কেনই বা পথ দেখিয়ে নিয়ে এলো। আরও আশ্চর্য, কাওসারকে সে এবার কোথায় নিয়ে চলেছে কে জানে......

কুকুরটা বনহুরের হাত চাটতে শুরু করেছে। বারবার লেজ নাড়ছে সে, আর সবার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছে। কিছু যেন বলতে চায় সে। তবে কাওসারকে যেন সে বেশি খাতির করছে।

বনহুর বললো আবার–এ আমাদের কোথায় নিয়ে যেতে চায় দেখা যাক।

কুকুর কাওসারকে লক্ষ্য করে একটু শব্দ করলো।

বনহুর বললো–দেখো ও কি যেন বলছে।

কাওসার কুকুরটার মাথায় হাত বুলিয়ে বললো–চল্ কোথায় যাবি, আমাদের নিয়ে চল্।

কুকুরটা যেন ওর কথা বুঝতে পারলো, চলতে শুরু করলো সে আগে আগে।

বনহুর, রহমান, রামসিং আর কাওসার রওনা দিলো কুকুরটার পিছু পিছু।

সুন্দর সুড়ঙ্গপথ।

সুড়ঙ্গপথটার মাঝে মাঝে শ্বেত-পাথর বসানো রয়েছে। তাই পৃথিবীর আলোকরশ্মি সুড়ঙ্গপথটাকে আলোকিত করেছে। পথ চলতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তাদের।

প্রায় কয়েক ঘন্টা অবিরাম চলার পর কুকুরটা এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়ালো। পা দিয়ে দেয়াল বেয়ে উঁচুতে উঠতে চেষ্টা করছে।

সবাই বুঝতে না পারলেও বনহুর বুঝতে পারলো-কুকুরটা উঁচুতে কিছু দেখাতে চায়।

বনহুর লক্ষ্য করলো, সত্যি দেয়ালে একটা গোল সুইচ রয়েছে। বনহুর বললো-রহমান, ঐ দেখো একটি গোল সুইচ।

হাঁ সর্দার, একটা সুইচ দেখা যাচ্ছে।

ওটা নিশ্চয়ই কোনো একটা কিছুর সুইচ হবে। কুকুরটা ঐ সুইচ টিপবার জন্য ইংগিত করছে। কথাটা বলে বনহুর সুইচে চাপ দিলো।

সঙ্গে সঙ্গে একটা দরজা বেরিয়ে পড়লো।

কুকুরটা সেই দরজা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলো। ওপাশে গিয়ে কুকুর বারবার লেজ নেড়ে তাদের ডাকতে লাগলো।

বনহুর বললো-চলো দেখা যাক কি হয়।

সবাই বনহুরকে অনুসরণ করলো।

আবার সেই সুড়ঙ্গপথ।

এগিয়ে চলেছে ওরা কয়েকজন।

ক্রমেই পথটা বেশ স্বচ্ছ হয়ে আসছে। একটা শব্দও শুনতে পাচ্ছে তারা সবাই মিলে। শব্দটা কোনো মেশিন বা যাতাকলের হবে, কারণ অবিরাম ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ হচ্ছে।

ওরা সবাই থমকে দাঁড়ালো।

কুকুরটা তাদের থামতে দেখে যেন একটু ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো, কেমন যেন একটা গোঁ গোঁ শব্দ করছে সে।

বনহুর বললো-আমাদের বিরতি দিলে চলবে না, দেখছো না ও কেমন চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

আবার চলতে শুরু করলো ওরা সবাই।

শব্দটা আরও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

আর বেশিদূর যেতে হলো না, তারা দেখতে পেলো অদূরে একটা কক্ষ, সেই কক্ষমধ্যে কোনো একটা মেশিন অবিরাম ক্যাঁচ-ক্যাঁচ আওয়াজ করে

চলেছে। বনহুর বললো—এই মেশিনটারই শব্দ আমরা এতোক্ষণ শুনতে পাচ্ছিলাম।

রহমান বললো—সর্দার, এটা কিসের মেশিন ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

রামসিং বললো—এটা বড় রহস্যময় মেশিন দেখছি।

বনহুর এগিয়ে গেলো, ভালভাবে পরীক্ষা করে বললো—এটা কোন বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনকারী মেশিন হবে।

বনহুরের কথা মিথ্যা নয়, ওটা একটি বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনকারী মেশিনই বটে। গভীর মাটির নিচে এই মেশিন বিদ্যুৎ ছড়িয়ে দিচ্ছে। বনহুর আর বিলম্ব না করে তার সহকারীদের নিয়ে অগ্রসর হলো।

কিন্তু কুকুরটা সম্মুখে না এগিয়ে উপরের দিকে বারবার তাকাতে লাগলো।

বনহুর বুঝতে পারলো সে ওখানে কিছু দেখাতে চায়। বললো বনহুর—রহমান, তোমরা উপর দিকে তাকিয়ে দেখো কিছু দেখা যায় কিনা।

রহমান, রামসিং আর কাওসার ভালভাবে লক্ষ্য করে দেখতে লাগলো।

বনহুর নিজেও দেখতে লাগলো মনোযোগ সহকারে। হঠাৎ আনন্দধ্বনি করে উঠলো সে—ঐ দেখো একটা ছিদ্রপথ।

রহমানও বললো—হাঁ সর্দার, ঐ ছিদ্রপথে আলোকরশ্মি দেখা যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।

রামসিং এবং কাওসারও তাকিয়ে দেখলো। সবার চোখেমুখে আনন্দদীপ্ত ভাব ছড়িয়ে পড়লো। বনহুর অল্পক্ষণ চেষ্টা করেই ছিদ্রপথটা কি বুঝতে পারলো। ওপাশে প্রচুর পৃথিবীর আলো রয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বনহুর বললো—রহমান, ঐ ছিদ্রপথটা বড় করবার কোনো কায়দা আছে নিশ্চয়ই। দাঁড়াও, আমি মেশিনটা পরীক্ষা করে বুঝতে পারবো।

বনহুর কথাটা বলে পুনরায় ফিরে গেলো সেই মেশিনটার পাশে। রহমান, রামসিংও গেলো তার সঙ্গে। বেশ কিছুক্ষণ পরীক্ষা করার পর একটা সুইচ দৃষ্টিগোচর হলো তার। বনহুর কৌশলে সুইচটা অফ্ করে দিলো। সঙ্গে সঙ্গে মেশিনটা বন্ধ হয়ে গেলো। সবাই বিস্ময় নিয়ে দেখলো ঐ ছিদ্রপথটা ধীরে ধীরে প্রশস্ত হয়ে যাচ্ছে। আরো একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটলো—ঐ ছিদ্রপথে নেমে এলো একটি ঝুলন্ত সিঁড়ি।

বনহুর আনন্দধ্বনি করে উঠলো এবং ছোট্ট শিশুর মত জড়িয়ে ধরলো কুকুরটাকে। তারপর বললো—রহমান, আর বিলম্ব নয়, সিঁড়ি বেয়ে উপরে

উঠে যেতে হবে। কিন্তু তার পূর্বে আমাদের বন্ধু কুকুরটাকে তুলে নিতে হবে।

হাঁ সর্দার, ওকে ছেড়ে আমরা উপরে যাবো না। বললো কাওসার।

বনহুর বললো–এর একটা নাম দেওয়া দরকার। আমরা একে 'বাঘা' বলে ডাকবো।

রামসিং-এর এ নামটা বড় পছন্দ হলো, সে বললো–খুব ভাল হবে এ নামটা ওর জন্য।

বনহুর বললো–তোমরা সবাই ওকে 'বাঘা বলেই ডাকবে।

বনহুর বাঘাকে তুলে নিলো কাঁধে। তারপর সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগলো।

রহমান বললো–সাবধান সর্দার, দেখবেন ওখানে নতুন কোনো বিপদ ওঁৎ পেতে আছে কিনা।

বনহুর অল্পক্ষণেই বাঘাকে কাঁধে করে ঝুলন্ত সিঁড়ি বেয়ে উপরে পৌছতেই বুঝতে পারলো, যে কক্ষমধ্যে সে এসে পৌছেছে ঐ কক্ষটা পৃথিবীর বুকে–ভূগর্ভে নয়।

বনহুর ইংগিত করলো তার অনুচরদের উপরে উঠে আসার জন্য। কুকুরটা তখন বারবার লেজ নেড়ে চলেছে।

অল্পক্ষণেই উঠে এলো তারা।

উপরে এসে সবাই দেখলো, তারা একটি পরিচ্ছন্ন আলোময় কক্ষের মেঝেতে দাঁড়িয়ে আছে। কক্ষমধ্যে তেমন কোনো আসবাবপত্র নেই। একপাশে কয়েকটা চেয়ার, মাঝে একটি টেবিল।

কুকুরটা কখন যে টেবিলের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ওরা খেয়াল করেনি।

বনহুর বললো–বাঘা কিছু বলতে চায়। ঐ দেখো সে বারবার টেবিলটার দিকে তাকাচ্ছে। বনহুর বাঘার মাথায় হাত রেখে বললো–ওখানে কি আছে বাঘা?

বাঘা যেন বনহুরের কথা বুঝতে পারলো, সে এক লাফে একটা চেয়ারের উপরে চেপে টেবিলটা শুঁকতে লাগলো।

বনহুর ভালভাবে টেবিলটা লক্ষ্য করতেই চমকে উঠলো, দেখলো জমকালো টেবিলটার উপরে চাপ চাপ রক্ত জমাট হয়ে আছে। বাঘা সেই রক্ত শুঁকছে। সবাই অবাক হয়ে দেখলো।

বনহুর বললো–এখানে কাউকে হত্যা করা হয়েছে......

বনহুরের কথা শেষ হয় না। বাঘা লাফ দিয়ে নিচে নেমে ছুটে গেলো ওপাশে। ওখানে একটা ছোট্ট আলমারী। বাঘা পা দিয়ে আলমারীর দরজা আঁচড়াতে লাগলো।

বনহুর বললো—এর মধ্যে কিছু আছে। রামসিং, রহমান এবং কাওসার সবাই বলে উঠলো—সর্দার, আমাদেরও মনে হচ্ছে ওর মধ্যে কিছু আছে।

বনহুর খুলে ফেললো আলমারীর দরজাটা এক টানে, সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট আওয়াজ করে উঠলো—নরমুণ্ড!

রামসিং, রহমান আর কাওসারের চোখেও বিস্ময় ফুটে উঠলো। তারা দেখলো আলমারীর মধ্যে একটা রেকাবির উপরে একটি নরমুণ্ড রয়েছে।

বনহুর রেকাবিসহ নরমুণ্ডটা বের করে আনলো। সবাই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলো। এ কি, কাওসারের মাথা:

কাওসার নিজেও অবাক হয়ে গেছে, ঢোক গিলে বললো—সর্দার, একি কান্ড!

বাঘা কিন্তু ভীষণভাবে লেজ নাড়ছে।

বনহুর বললো—এই কারণেই বাঘা কাওসারকে এভাবে আপন করে নিতে পেরেছে। বাঘার মনিব ছিলো ঠিক কাওসারের মত একই চেহারার।

রামসিং, রহমান, কাওসার সবাই যেন একেবারে বোবা বনে যায়। কে এই ব্যক্তি ছিলো যার চেহারা কাওসারের সঙ্গে হুবহু মিল রয়েছে। বনহুর নরমুণ্ডটা ভালভাবে লক্ষ্য করে বললো—আজ একে হত্যা করা হয়নি, হত্যা করা হয়েছে দু'দিন পূর্বে।

রেকাবিসহ নরমুণ্ডটা পুনরায় রাখতে যাচ্ছে বনহুর, ঐ সময় হঠাৎ তার নজরে পড়লো নরমুণ্ডটার পাশে একটা চাবি। বনহুর রেকাবিটা রেখে চাবিটা তুলে নিলো হাতে। দেখলো পাশেই দেয়ালে একটি বিরাট তালা ঝুলছে। বনহুর চাবি দিয়ে তালাটা খুলে ফেললো। সঙ্গে সঙ্গে একটা দরজা বেরিয়ে পড়লো, ওপাশে ছোট্ট একটা কুঠরী। বনহুর ভিতরে প্রবেশ করলো, দু'চোখে তার ধাঁ ধাঁ লেগে গেলো। ছোট্ট কুঠরীটার মধ্যে বহু মূল্যবান মণি-মুক্তা-হীরা থরে থরে সাজানো রয়েছে। রহমান, কাওসার ও রামসিং সবাইকে বনহুর ডেকে বললো—দেখো, একটা গোপন কুঠরী, এখানে কত মূল্যবান মণি-মুক্তা-হীরা সাজান রয়েছে।

বনহুরের কথায় সবাই ভিতরে প্রবেশ করলো।

অবাক হয়ে গেলো ওরা।

বনহুর বললো—কাওসার, বাঘা তোমাকে ঠিক পথেই নিয়ে এসেছে। এখন থেকে বাঘা আমার সঙ্গে থাকবে। ও সত্যি বড় বুদ্ধিমান।

কাওসার বলে উঠলো—সর্দার, সব যেন কেমন রহস্যপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে।

হাঁ, রহস্যপূর্ণই বটে। কিন্তু এই সবের মূলে ছিলো ঐ গুলবাগের মালিক মিঃ প্রিন্স। এসব তারই চক্রান্ত। আমার মনে হচ্ছে, এই নরমুণ্ড যার তারই এই ধনভান্ডার এবং বাঘা তারই ছিলো।

রহমান বললো—বাঘা থাকতে তার মনিবকে কি করে হত্যা করলো ভেবে পাচ্ছি না আমি।

বনহুর গম্ভীর গলায় বললো—নিশ্চয়ই বাঘাকে আটকে রাখা হয়েছিলো এবং তার মনিবকে তারই সম্মুখে হত্যা করা হয়েছিলো।

আপনি কি করে এ কথা জানতে পারলেন সর্দার?

জানতে পারিনি তবে অনুমানে মনে হচ্ছে। বাঘার সম্মুখে মনিবকে হত্যা করা হয়, তারপর তার মাথাটা কেটে নেওয়া হয়। বাঘার মনিবেকে ঐ টেবিলে হত্যা করা হয়েছে তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি—টেবিলে চাপ চাপ রক্ত শুকিয়ে আছে।

হাঁ সর্দার, ঠিকই বলেছেন। কিন্তু মিঃ প্রিন্স তাকে হত্যা করলো কেন? প্রশ্নটা করলো রহমান।

হত্যা করেছে এই মূল্যবান বস্তুগুলোর লোভে।

তবে সে চাবিটা ওভাবে নরমুণ্ডটার পাশে রেখে গেছে কেন? এবারও রহমান জিজ্ঞাসা করলো।

মিঃ প্রিন্স জানতো, এই দুর্গম সুড়ঙ্গপথে কেউ এখানে এসে পৌঁছবে না। তা ছাড়া নিচে যে মেশিন চলতে দেখেছিলে, ওটা ছিলো বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী মেশিন। ওটা চালু থাকলে কেউ কোনো সময় এই কক্ষে প্রবেশে সক্ষম হতো না, কারণ এ কক্ষের দেয়ালে ইলেকট্রিক কারেন্ট সংযোগ থাকতো। হাঁ, আরও একটি কথা, এই যে নরমুণ্ড দেখছো এটা নিশ্চয়ই মিঃ প্রিন্সের পরম বন্ধুলোক ছিলো। না হলে মিঃ প্রিন্স তার এই গোপন কুঠরীর সন্ধান পেতো না। যাক, আমরা এবার যে সম্পদ পেলাম এতে পাকিস্তানী বাঙ্গালী উদ্ধার ব্যাপারে আর আমাদের বিশেষ বেগ পেতে হবে না। ও, তুমি জিজ্ঞাসা করেছিলে চাবিটা সে নরমুণ্ডের পাশে কেন রেখে গিয়েছিলো?

হাঁ সর্দার, আমি এখনও তাই ভাবছি।

ঐ তো, প্রথম হলো সে জানতো এখানে কেউ আসবে না; আর দ্বিতীয়তঃ হলো সে হিংসাত্মকভাবে চাবিটা নরমুণ্ডে পাশে রেখে সে নিজকে বেশি গর্বিত মনে করেছিলো। কিন্তু মিঃ প্রিন্সের সব আশা, সব স্বপ্ন মুছে দিয়েছি......হাঃ হাঃ হাঃ–প্রিন্স ভেবেছিলো তার চক্রান্ত, তার শয়তানি চিরস্থায়ী হবে। একটু থেমে বললো বনহুর–রহমান, আরও একটি কথা তোমরা শুনে রাখো; শয়তান মিঃ প্রিন্স যমদূতের বেশে তারই হোটেলে গুলবাগের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী মিস শাম্মীকে হত্যা করেছিলো। শুধু হত্যাই করেনি, শাম্মীকে আমি আমার একটি অংগুরি উপহার দিয়েছিলাম; শয়তান সেই অংগুরি তার আংগুল থেকে খুলে নিয়েছিলো। বনহুরের চোখ দুটো আগুনের ভাটার মত জ্বলে উঠলো–প্রিন্সকে হত্যা করে তুমি ভুল করেছিলে রহমান। আমি তার কাছে জেনে নিতে পারলাম না শাম্মীর আংগুলের অংগুরি সে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে। শাম্মী বলেছিলো, আমি কোনদিনই আপনার এ দান আমার কাছ থেকে সরাবো না। কিন্তু......শয়তান যমদূত তার সে আশা পূর্ণ হতে দেয়নি। জানো রহমান, এখানেই কোনো এক গোপনপথ আছে, যে পথে মিঃ প্রিন্সের শয়নকক্ষে প্রবেশ করা যাবে।

রহমান বললো–হাঁ সর্দার, সেই রকমই মনে হচ্ছে। আপনি বলেছিলেন মিঃ প্রিন্সের কক্ষের দেয়ালে বিদ্যুৎ সংযোগ ছিলো। তাহলে বোঝা যাচ্ছে, ঐ ভূতলকক্ষ থেকেই বিদ্যুৎ উৎপাদন হতো এবং এসব কক্ষে বিদ্যুৎ ছড়িয়ে পড়তো।

বনহুর বললো–ঠিক তাই ছিলো। আমরা মিঃ প্রিন্সের বাসভবনের অতি নিকটে পৌছে গেছি তাতে কোনো সন্দেহ নেই। রহমান, এই ধনভান্ডারের গোপনপথ আমাদের মানচিত্রে এঁকে রাখতে হবে, কারণ আমরা প্রয়োজনমত এখানে আসবো। এখন চলো যাওয়া যাক।

বনহুর, রহমান, কাওসার আর রামসিং বেরিয়ে এলো ধনভান্ডারের মধ্য থেকে। বনহুর পুনরায় তালাবদ্ধ করে দিলো। আবার তারা ফিরে চললো সেই পথে, যে পথে এখানে এসেছিলো।

এবার বাঘা কিছুতেই ফিরে যাবে না, কেমন যেন মুখ ভার করে বসে রইলো।

সবাই মিলে অনেক টানাটানি করলো তবু নীরব বাঘা। এমনকি কাওসার পর্যন্ত পরাজয় বরণ করলো ওকে সঙ্গে নিতে।

যখন কাওসারও হতাশ হয়ে পড়লো তখন বনহুর এগিয়ে এলো, বাঘার মাথায় হাত বুলিয়ে বললো–বাঘা, যাবি না আমাদের সঙ্গে?

বাঘা নীরব।

বনহুর ওর গলায়-মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে বললো আবার–চল্, তুই এখন থেকে আমার সঙ্গে থাকবি। তোকে কোনোদিন তাড়িয়ে দেবো না।

বাঘা বনহুরের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলো, সে যেন তার কথাগুলো বুঝতে পারছিলো। এবার বাঘা বনহুরের হাত চাটতে লাগলো।

বললো বনহুর–কাওসার, বাঘা রাজি হয়ে গেছে, এবার সে যাবে আমাদের সঙ্গে। চলো, রওনা দেওয়া যাক।

বনহুর অগ্রসর হলো।

বাঘা এবার অনুসরণ করলো তাকে।

রহমান হেসে বললো–সর্দার, বাঘা ঠিক আপনার কথা বুঝতে পেরেছে। দেখুন সে আপনাকে লক্ষ্য করে এগিয়ে চলেছে।

বনহুর আবার একটু নত হয়ে বাঘাকে আদর করে নিলো, তারপর বললো–বন্ধু, আমার জীবন রক্ষা করেছো, এখন আমাকে ছেড়ে যাবে! চলো, তুমি আবার আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলো।

❑

নাসিমা অবাক হয়ে বনহুরের কথাগুলো শুনছিলো। অদূরে বসে আছে বাঘা, দু'পায়ের মাঝখানে মাথা রেখে পিট পিট করে তাকাচ্ছিলো বনহুর আর নাসিমার দিকে। সে যেন বুঝতে পারছে ওরা তারই কথা নিয়ে আলোচনা করছে।

বনহুর বললো–এবার আমি জীবনরক্ষা পেলাম বাঘার বুদ্ধিবলে, তাতে কোনো ভুল নেই।

নাসিমা সব শুনে বাঘার প্রতি একটা বিপুল প্রীতিভাব নিয়ে তাকালো। ওর মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগলো সে। বাঘা লেজ নেড়ে তাকে শ্রদ্ধা জানাতে লাগলো।

বনহুর কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে বললো–মিস নাসিমা, এখন আপনি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত, কারণ জাফর হুসাইন এবং মিঃ প্রিন্স উভয়েই পরপারে চলে গেছে। বলুন, এবার আপনি কোথায় যেতে চান?

নাসিমার মুখমন্ডল গম্ভীর হয়ে পড়লো, সে কোনো জবাব দিলো না। মাথা নত করে রইলো শুধু।

বনহুর একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে গা এলিয়ে বসলো, তারপর বললো–মিস নাসিমা, আপনি জানেন পাকিস্তান আপনার জন্য মঙ্গলময় স্থান নয়। তাছাড়া আপনার আব্বা বাংলাদেশে পৌঁছেও শান্তি পাচ্ছেন না যতক্ষণ না আপনি তাঁর কাছে পৌঁছেছেন। কাজেই আপনি বাংলাদেশে ফিরে যান।

নাসিমা তাকালো বনহুরের মুখের দিকে, চোখেমুখে একটা ব্যথাকরুণ ভাব, বললো সে–আপনি যদি বাংলাদেশে ফিরে যাবেন তাহলে আমিও যাবো, নাহলে আমি পালিয়ে বাঁচতে চাইনা।

বনহুর নাসিমার কথায় বিস্ময়ভরা চোখে সোজা হয়ে বসলো, বললো–আপনি এসব কি বলছেন মিস নাসিমা?

হাঁ, আমার জীবন আপনি রক্ষা করেছেন, কাজেই আমি আপনার কাছে চিরঋণী। আপনাকে একা ফেলে আমি যেতে পারি না।

হাসলো বনহুর। আবার সে গা এলিয়ে দিয়ে সিগারেট থেকে ধূয়া নির্গত করে চললো।

নাসিমা তাকিয়ে আছে বনহুরের মুখমণ্ডলের দিকে। দৃষ্টি যেন তার পড়তে চায় না। ভাবছে সে বনহুরের সেই মূহূর্তগুলোর কথা। তাকে রক্ষার জন্য তার কত না উদ্দীপনা, সে কি সংগ্রাম–শেষ পর্যন্ত জয়ী হলো বনহুর।

নাসিমাকে ভাবতে দেখে বলে বনহুর–মিস নাসিমা, আপনি কি ভাবছেন জানি না কিন্তু আমি যা বলছি তা আপনাকে করতেই হবে। আপনি তো সব জানেন এখানে আমার অনেক কাজ আছে। তাছাড়া বাংলাদেশে হয়তো আমার আর যাওয়া হয়ে উঠবে না......

বিস্ময় ভরা অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠে নাসিমা–কেন?

মিস নাসিমা, আমি বাঙ্গালী হলেও আসলে বাংলাদেশ আমার জন্মভূমি নয়।

বাংলাদেশ আপনার জন্মভূমি নয়!

না।

তাহলে......

আপনাকে বলেছি আমার জীবন স্বাভাবিক জীবন নয়। আমার জন্ম সভ্যসমাজে হলেও আমি মানুষ হয়েছি অস্বাভাবিক পরিবেশে। গভীর অরণ্যে হিংস্র জীবজন্তুর মধ্যে আমি বড় হয়েছি। অরণ্যের ফল ভক্ষণ করে আমার

শরীর পুষ্ট হয়েছে। কাজেই আমি নিজেও অস্বাভাবিক তাতে কোনো সন্দেহ নেই। জন্ম আমার অজানা এক দেশে......

নাসিমা বলে উঠলো—অরণ্যের আলো-বাতাসে বড় হয়েছেন, অরণ্যের জীবজন্তুর সঙ্গে বাস করেছেন মেনে নিলাম কিন্তু সে তো বাংলাদেশেরই কোনো এক অরণ্য......

না।

তবে?

সে এক অজানা দেশ, বাংলাদেশ নয়।

বাংলাদেশ নয়?

না। আপনি হয়তো শুনে থাকবেন কান্দাই বলে কোনো একটা দেশ আছে?

হাঁ, আমি শুনেছি। কান্দাই সে তো বহু দূরদেশ।

সেই কান্দাই-এর কোনো এক অরণ্যে আমার বাসভূমি।

আপনি, আপনি তাহলে......

হাঁ, আমি কান্দাই থেকে এদেশে এসেছি। শত শত বাঙ্গালী ভাই-মা-বোনদের করুণ কান্না আমাকে টেনে এনেছে এদেশে।

আপনি তাহলে বাংলাদেশে যাবেন না?

কাজ শেষ হলে আমাকে আবার জন্মভূমিতে ফিরে যেতে হবে মিস নাসিমা। তাই বলছি আপনি বাংলাদেশে আপনার পিতার কাছে ফিরে যান।

কিন্তু......

বলুন কি বলতে চান আপনি?

কিন্তু আমার সে ফিরে যাওয়া ব্যর্থ হবে মিঃ হাসান।

কেন?

না না, আমি আর বলতে পারবো না।

জানি আপনি কি বলতে চেয়েও পারছেন না। মিস নাসিমা, আপনি ভুলে যাচ্ছেন আমি একজন ডাকু, একজন দস্যু।

তবু আমি আপনাকে ত্যাগ করতে পারবো না।

জানতাম এ কথাই আপনি বলবেন। মিস নাসিমা, আপনার পিতার অনুরোধ রক্ষার্থে আমি আপনাকে শত্রুর কবল থেকে উদ্ধার করেছি, আপনাকে ভালবেসে নয়।

মিঃ হাসান!

হাঁ মিস নাসিমা, কারণ কর্তব্য আমার কাছে অনেক বড়। আমি আপনার আব্বাকে কথা দিয়েছিলাম, আপনাকে রক্ষা করেছি। যতক্ষণ না আপনাকে আপনার আব্বার কাছে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছি ততক্ষণ আমার কর্তব্য বাকি রয়ে গেছে......

না না, আমি আপনাকে ছাড়া বাংলাদেশে ফিরে যাবো না মিঃ হাসান। আপনি কাজ শেষ করুন, আমি ততদিন আপনার জন্য অপেক্ষা করবো। আপনি না গেলে আমি যাবো না।

সেকি! আপনি আপনার আব্বার কাছে ফিরে যেতে চাননা মিস নাসিমা?

চাই—কিন্তু আপনাকে সঙ্গে করে।

আপনি শিক্ষিতা তরুণী অথচ......

মিঃ হাসান, আমি যে আপনাকে মনে প্রাণে গ্রহণ করেছি। আপনি ছাড়া আমি কাউকে ভাবতে পারি না। আমার জীবনের চেয়ে আমি আপনাকে বেশি ভালবেসে ফেলেছি মিঃ হাসান।

নাসিমার কথায় বনহুরের মুখমণ্ডল গম্ভীর হলো, ভ্রুকুঞ্চিত করে বললো—আপনি ভুল করেছেন মিস নাসিমা, কারণ আপনার ভালবাসা গ্রহণ করার মত আমার......

নাসিমা বনহুরের পাশে সরে এসে, তার মুখে হাতচাপা দেয়—না না, আপনি এখন কথা বলবেন না, যা আমার মনকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবে। মিঃ হাসান, আজ আমি বড় অসহায়, বড় একা......

বনহুর নীরবে সিগারেট পান করে চলে। দৃষ্টি তার সম্মুখের জানালা দিয়ে চলে গেছে দূরে সীমাহীন আকাশে। নাসিমার কথাগুলো তার হৃদয় স্পর্শ করে কিন্তু সে তো নিরুপায়। নাসিমার মত একটি উচ্চশিক্ষিতা সুন্দরী তরুণী তাকে ভালবাসে, এতে তার আনন্দিত, গর্বিত হওয়ার কথা। তা হয় না বনহুরের, বরং তার মন ব্যথাকাতর হয়ে উঠে। মনে পড়ে শাম্মীর কথা...বেচারী শাম্মী তাকে ভালবেসে প্রাণ দিলো। আবার নাসিমা এসেছে তার প্রেম, তার ভালবাসার কাঙ্গালিনী হয়ে......

নাসিমার বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠ—আপনি আমাকে ভালবাসতে পারবেন না—তবে কেন, কেন আমাকে রক্ষা করতে গেলেন?

মিস নাসিমা, আপনি অবুঝ হচ্ছেন কেন! আমি আপনাকে ভালবাসি না, একথা আপনাকে কে বললো?

তবে কেন আমার ভালবাসা আপনি গ্রহণ করতে চান না? কেন আপনি আমাকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিতে চান?

সে কথা আপনাকে পূর্বেই বলেছি। আপনার আব্বা আপনার জন্য প্রতীক্ষা করছেন। যতদিন না আপনি বাংলাদেশে ফিরে যান ততদিন তিনি নিশ্চিন্ত নন।

জানি, আব্বা আমার জন্য অধীর চিত্তে অপেক্ষা করছেন, কিন্তু......কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে আসে নাসিমার, কথা শেষ করতে পারে না সে।

হঠাৎ বাঘা ঘেউ ঘেউ করে উঠে।

বনহুর উঠে গিয়ে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বলে–কিরে, অমন করছিস কেন?

বাঘা তবু ঘেউ ঘেউ শব্দ করে চললো।

বনহুর তাকালো ঐদিকে যেদিকে লক্ষ্য করে বাঘা আওয়াজ করছিলো। বনহুর দেখলো, বিরাট একটা সাপ ফাটলের মধ্য থেকে মাথা বের করে দিচ্ছে। বাঘা সাপটাকে লক্ষ্য করে চিৎকার করছিলো। বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে প্যান্টের পকেট থেকে রিভলভার বের করে সাপটার মাথায় গুলী করলো।

সঙ্গে সঙ্গে সাপটা সম্পূর্ণ বেরিয়ে এলো ফাটলটার ভিতর থেকে। মাথাটা থেতলে গেছে একেবারে। কয়েকবার ওলটপালট করে নীরব হয়ে গেলো সাপটা।

নাসিমার দু'চোখে বিস্ময়।

বনহুর বললো–পোড়োবাড়ি, এখানে অনেক হিংস্র জীব রয়েছে। বাঘা যদি না দেখতো সাপটা পিছন থেকে দংশন করতো আপনাকে।

সেই ভাল হতো মিঃ হাসান।

কেন?

জানি না।

জানেন না। নিজে মরতে চাইছেন অথচ জানেন না কেন মরতে চান? আশ্চর্য......

বেঁচে থাকার ইচ্ছা আর আমার নেই।

কারণ?

মা-ভাই-বোন সবাইকে হারিয়ে আমার বেঁচে থেকে লাভ কি? আব্বা বৃদ্ধ, ক'দিনই বা বাঁচবেন তিনি!

হুঁ, তা ঠিক তবু আপনাকে বাঁচতে হবে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আপনার মত বহু বোন সর্বস্বহারা হয়েছে, তাই বলে সবাই কি আত্মহুতি দেবে? মিস নাসিমা, আপনি বুদ্ধিমতী শিক্ষিতা, সবই আপনি বোঝেন। আপনাকে আমি আপনার পিতার কাছে পৌঁছে দিচ্ছি, আপনি এতে অমত করবেন না।

নাসিমা কোনো কথা বললো না। মাথা নিচু করে বসে রইলো।

বনহুর বাঘাকে লক্ষ্য করে বললো–চল্ বাঘা, দেখি ওরা কোথায় কি করছে।

বনহুর বাঘাকে সঙ্গে করে বেরিয়ে গেলো।

ওদিকে রহমান, কাওসার আর রামসিং খাবার যোগাড়ে ব্যস্ত। কোথা থেকে এক বস্তা ময়দা জোগাড় করেছে, তাই রুটি তৈরি করছিলো ওরা।

বনহুর হেসে বললো–তোমরা এখানে খাবার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছো, ওখানে দেখবে যাও, মস্ত একটা সাপ বেরিয়েছিলো।

সাপ! বললো কাওসার।

হাঁ সাপ কিন্তু সেটাকে হত্যা করেছি, অবশ্য সাপটা হত্যার কৃতিত্ব বাঘার। বাঘা যদি সাপটা দেখে চিৎকার না করতো তা হলে সাপটা আজ নাসিমাকে কামড়ে দিতো তাতে কোনো ভুল নেই।

রহমান বললো–সর্দার, এখানে মিস নাসিমাকে রাখা মোটেই উচিত হবে না, কারণ এ বাড়িটা বহুদিনের পুরানো বাড়ি। নানা রকম বিষাক্ত জীবজন্তু আছে।

হাঁ রহমান, এখানে প্রতিমুহূর্তে বিপদ ঘটতে পারে, কাজেই নাসিমাকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়াই ভাল। কিন্তু ওকে কোথায় রাখা যায় ভাবছি। ওকে নিয়েই আমার বড় দুশ্চিন্তা।

নাসিমা আড়াল থেকে বনহুরের কথাগুলো শুনতে পায়। আনন্দে চোখ দুটো তার ছল ছল করে উঠে। ভাবে নাসিমা, তার জন্য মিঃ হাসানের চিন্তার অন্ত নেই! নিশ্চয়ই সে তাকে ভালবাসে।

কিছুক্ষণ পূর্বে মিঃ হাসানের উপর নাসিমার যে রাগ বা অভিমান হয়েছিলো সব মুছে যায়। ফিরে যায় সে নিজের কক্ষে।

❑

হীরাঝিল।

নির্জন পাহাড়িয়া জায়গায় সাদা পাথরে তৈরি বিরাট বাড়ি। এ বাড়িটার মধ্যে প্রায় পাঁচশ, কুঠির বা কক্ষ আছে।

বাড়িটার সম্মুখে এক বড় পাহাড়িয়া ঝরণা বয়ে চলেছে। সুন্দর সচ্ছ পানি ছোট-বড় পাথর গড়িয়ে নিচে নেমে যাচ্ছে। বাড়িটার আশেপাশে কোনো লোকালয় নেই। চারিদিকে শুধু ছোট-বড় টিলা।

বাড়িটার মাঝখানে একটি বড় ঘর আছে, এটা হীরাঝিলের নাচঘর। হীরাঝিলের মালিক জাফর হুসাইনের অন্তর্ধানের পর এই নাচঘরে কোনো উৎসব হয়নি। জাফর হুসাইন থাকাকালে প্রায়ই এই নাচঘর নাচ পরিবেশন হতো।

নাচঘর অন্ধকারময়।

শুধু গভীর রাতে এই নাচঘরে করুণ কান্নার আওয়াজ শোনা যায়।

জাফর হুসাইনের অনুচরবর্গ প্রতিরাতে হীরাঝিলের বাঙ্গালী বন্দী নারীদের ধরে এনে এখানে তাদের উপর চালায় নানারকম অকথ্য অত্যাচার।

হীরাঝিলে পাঁচশ, কুঠিরে প্রায় পাঁচ হাজার বাঙ্গালী বন্দী আটক করে রাখা হয়েছে। নারীদের রাখা হয়েছে পৃথক করে। এদের মধ্যে যারা তরুণী তাদের রাখা হয়েছে সম্পূর্ণ আলাদা।

মাঝে মাঝে গ্রাহক আসে, এই সব তরুণীকে বাছাই করে উচিত মূল্য দিয়ে নিয়ে যায়। যার সৌন্দর্য যত বেশি তার মূল্য তত অধিক। জাফর হুসাইন এ সব তরুণীকে বিনামূল্যে পায়নি, সেও অন্যান্য মহাজনের কাছ থেকে ক্রয় করে নিয়েছিলো।

এখন জাফর হুসাইন না থাকলেও তারা অনুচরগণ আছে, এরাই ব্যবসা চালিয়ে চলেছে। জাফর হুসাইনের প্রধান অনুচর শামস হুসাইন, সেই এখন হীরাঝিলের মালিক।

শামস হুসাইন জাফর হুসাইনের শুধু অনুচরই নয়, তার আত্মীয়ও বটে। কাজেই হীরাঝিলের উপর তার দাবীও আছে।

শামস হুসাইন জাফর হুসাইনের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। যেমন সে দুষ্ট-শয়তান-লম্পট, তেমনি বলিষ্ঠ জোয়ান, ভীষণ শক্তিশালী। প্রতিরাতে সে ইচ্ছামত মেয়েদের বেঁধে নিয়ে আসে এবং তাদের উপর চালায় অত্যাচার।

জাফর হুসাইন না থাকায় তার বেশি সুবিধা হয়ে গেছে। তার খুশিমত কাজ করে, যা মনে হয় তাই করে সে।

অন্যান্য দিনের মত আজও শামস হুসাইন হীরাঝিলের মাঝখানের হলঘরটায় বসে শরাব পান করে চলেছে আর চারপাশে চারজন লোক বসে তাল যুগিয়ে চলেছে।

রাত বেড়ে আসছে। হীরাঝিলের বাতিগুলো নিভে গেলো টপ্ টপ্ করে। শুধু ডিমলাইটগুলো নীলাভো আলো ছাড়াচ্ছে।

শামস হুসাইন ও তার সঙ্গীরা মদের নেশায় বুঁদ। এমন সময় দু'জন লোক একটি তরুণীকে নিয়ে হাজির হলো। তরুণীর দু'বাহু ধরে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে এলো তারা। তরুণীর চুল এলায়িত, বস্ত্রাঞ্চল ভূতলে লুটোপুটি খাচ্ছে। ভীত আতঙ্কিত মুখমণ্ডল। রীতিমত হাঁপাচ্ছে তরুণীটি।

শামস হুসাইন তরুণীটিকে দেখাবামাত্র উঠে দাঁড়ালো। দু'চোখে তার লালসাপূর্ণ ভাব। কুৎসিত শব্দ করে হাত বাড়ালো তরুণীটির দিকে।

ঠিক ঐ মুহূর্তে উদ্যত রিভলভার হাতে শামস হুসাইনের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো জমকালো পোশাকপরা একটি লোক। গম্ভীর কণ্ঠে বলে—খবরদার, ওকে স্পর্শ করো না।

শামস হুসাইন মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়ালো, তারপর কঠিন কণ্ঠে বললো—কে তুমি?

আমি তোমার আজরাইল।

এ্যাঁ, কি বললে তুমি আজরাইল? কথাটা বলে সোজা হয়ে দাঁড়ালো শামস হুসাইন। সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়লো সে জমকালো পোশাক পরা লোকটার উপর।

শুরু হলো ধস্তাধস্তি।

অন্যান্য যারা শামস হুসাইনের সঙ্গে ছিলো তারা ভীত হয়ে যে যেদিকে পারলো ছুটে পালিয়ে গেলো।

যমকালো পোশাকপরা ব্যক্তি অন্য কেউ নয় স্বয়ং দস্যু বনহুর।

যত শক্তিশালীই হোক শামস হুসাইন, বনহুরের সঙ্গে পেরে উঠা ওর মুস্কিল ছিলো। ইচ্ছা করলে বনহুর ওকে গুলী করে হত্যা করতে পারতো

কিন্তু বনহুর তাকে হত্যা করবে না, কারণ হীরাঝিলের চাবিকাঠি রয়েছে শামস হুসাইনের হাতে। বনহুর ওকে জীবিত পাকড়াও করতে চায়। ভীষণ ধস্তাধস্তি চলছে, হঠাৎ একসময় শামস হুসাইন বনহুরের হাত থেকে নিজকে ছাড়িয়ে নিয়ে লাফ দিলো পাশের মুক্ত জানালা দিয়ে বাইরে।

বনহুরও বিলম্ব না করে তাকে অনুসরণ করলো।

ওপাশে লম্বা টানা বারান্দা।

শামস হুসাইন দৌড় দিলো।

বনহুর ওকে অনুসরণ করে এগিয়ে চলছে। শামস হুসাইন বুঝতে পেরেছে ওর হাত থেকে নিস্তার নেই, তাই সে মরিয়া হয়ে ছুটছে। বারান্দা পার হয়ে ছাদের রেলিং বেয়ে এগুতে শুরু করলো শামস হুসাইন। এবার সে ভাবলো, ও বুঝি তাকে অনুসরণ করতে সক্ষম হবে না।

কিন্তু বনহুরের অসাধ্য কিছু নেই, সেও শামস হুসাইনকে অনুসরণ করে রেলিং বেয়ে এগুতে লাগলো।

শামস হুসাইন একটা পাইপ বেয়ে উঠে গেলো উপরে। বনহুরও সেই পাইপ বেয়ে উপরে উঠে পড়লো। কিন্তু কোথায় শামস হুসাইন! বনহুর এদিক ওদিক তাকাতে লাগলো।

হঠাৎ বনহুর দেখলো অদূরে উঁচু আর একটি পাইপ বেয়ে শামস হুসাইন তরতর করে উপরে উঠে যাচ্ছে।

বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে ছাদের রেলিং বেয়ে এগুতে লাগলো। একে রাত, তারপর সম্পূর্ণ অজানা, অচেনা জায়গা। ভাগ্যি জ্যোছনা ছিলো, তাই সব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলো বনহুর। শামস হুসাইন যখন একটি এগারো তলার পাইপ বেয়ে উপরে উঠে চলেছে তখন বনহুর তার রিভলভার উদ্যত করে ধরলো। সঙ্গে সঙ্গে তার মন বললো......না না, ওকে হত্যা করো না, তাহলে হীরাঝিলের গভীর রহস্য উদঘাটন হবে না......বনহুর রিভলভার সহ হাতখানা নামিয়ে নিলো। পরক্ষণেই রিভলভার প্যান্টের পকেটে রেখে তর তর করে পাইপ বেয়ে উপরে উঠে চললো।

শামস হুসাইন একবার তাকিয়ে দেখে নিলো। ততক্ষণে বনহুর অনেকটা পাইপ বেয়ে উঠে এসেছে। বনহুর যখন মাঝামাঝি এসে পৌঁচেছে তখন শামস হুসাইন এগারো তলার একটি কক্ষে পিছন জানালা দিয়ে প্রবেশ করে।

বনহুর কক্ষটাকে লক্ষ্য রেখে দ্রুত এগুতে লাগলো। কয়েক মিনিটেই এসে পড়ে সেই কক্ষের পিছন জানালাটার পাশে। মুহূর্ত বিলম্ব না করে সেও লাফিয়ে পড়ে জানালা দিয়ে ভিতরে।

বনহুর কক্ষের মেঝেতে লাফিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পায় শামস হুসাইন ওদিকের দেয়ালে একটা সুইচে হাত রাখলো। মাত্র এক সেকেন্ড, বনহুর অনুভব করলো তার পায়ের নিচের মেঝেটা যেন সাঁ করে একপাশে সরে গেলো। মুহূর্ত বিলম্ব না করে বনহুর হাতের কাছে একটা রড পেলো সেটা ধরে ফেললো খপ করে। মেঝে থেকে প্রায় দশ হাত নিচে সেই রডখানা ছিলো। বনহুর তাকিয়ে দেখলো, একেবারে এগারো তলার নিচে পাথুরে মেঝে, আর একটু হলেই এতোক্ষণে তার দেহটা থেতলে একখণ্ড মাংসপিণ্ডে পরিণত হতো।

বাদুড়ের মত ঝুলছে বনহুর, পায়ের নিচে শূন্য, ফাঁকা। কত গজ নিচে যে একতলার মেঝেটা আছে জানে না সে। তবে এটুকু বুঝতে পারছে তার হাত দু'খানা খুলে গেলে আর নিস্তার নেই, মৃত্যু তার হবেই।

হঠাৎ এমন একটা অবস্থায় পড়বে ভাবতে পারেনি বনহুর। শয়তানটাকে হাতেনাতে ধরবে এটাই ছিলো তার উদ্দেশ্য। কিন্তু ব্যাপার ঘটে গেলো সম্পূর্ণ আলাদা।

বাদুড় ঝোলার মত ঝুলছে বনহুর। হঠাৎ তার কানে গেলো অট্টহাসির আওয়াজ! বনহুর মুখ তুলে তাকালো উপরের দিকে, সঙ্গে সঙ্গে নজরে পড়লো সেই মুখখানা। শামস হুসাইন তার অবস্থা লক্ষ্য করে হাসছে।

রাগে-ক্ষোভে দৃষ্টি নত করে নিলো বনহুর। শূন্য ফাঁকার উপরে ঝুলন্ত অবস্থায় অত্যন্ত কষ্ট হচ্ছে তবু মুখমণ্ডলে তার দৃঢ়তার আভাস।

কানে এলো বনহুরের সেই কণ্ঠ একটু পূর্বে যে কণ্ঠে সে শুনতে পেয়েছিলো হাসির শব্দ। বলছে শামস হুসাইন—কেমন, এবার নিজকে রক্ষা করো। এসেছিলো আমার জান নিতে......কথাটা শেষ করে আবার অট্টহাসি হাসতে শুরু করে।

বনহুর বারবার হাত বদলাচ্ছে। লালে লাল হয়ে উঠেছে তার হাত দুটো।

আবার শামস হুসাইনের বিদ্রুপ ভরা কণ্ঠ—কতক্ষণ ঝুলবে বাছাধন। তোমার আয়ু ফুরিয়ে এসেছে, দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজাটা......কোন একটা সুইচে হাত দিলো শামস হুসাইন। সঙ্গে সঙ্গে লৌহ রডটা দুলতে শুরু করলো।

ভীষণভাবে দুলছে রডটা, বনহুরের হাত দু'খানা ক্রমে শিথিল হয়ে আসছে। সমস্ত দেহ ঘেমে নেয়ে উঠেছে, বারবার অধর দংশন করছে সে।

শামস হুসাইন দাঁতে দাঁত পিষে বললো–এইবার তোমার মৃত্যু। আমি দ্বিতীয় সুইচে চাপ দিলেই খসে পড়বে রডখানা, সঙ্গে সঙ্গে এগারো তলার নিচে পাথরের মেঝেতে পড়ে তোমার দেহটা টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। মৃত্যুর পূর্বে বলো কে তুমি, আর কেনই বা এখানে এসেছিলে?

বনহুরের মুখে কঠিন এক দৃঢ়ভাব ফুটে উঠে, বলে সে–মৃত্যুকে ভয় করে নিজের পরিচয় তোমার মত শয়তানকে জানাবো এমন কু'মনোবৃত্তি আমার নেই।

আচ্ছা! এই মনোবৃত্তি তোমার কোথায় থাকে দেখি......কথাটা বলে শামস হুসাইন পিছনের দেয়ালে একটি সুইচের দিকে হাত বাড়ায়।

সঙ্গে সঙ্গে একখানা ছোরা এসে বিদ্ধ হয় শামস হুসাইনের দক্ষিণ হাতে। শামস হুসাইনের সুইচ অন করা আর হলো না, তীব্র একটা আর্তনাদ করে উঠলো সে।

বনহুর ঝুলন্ত অবস্থায় তাকালো শামস হুসাইনের মুখের দিকে। দেখলো শামস হুসাইনের মুখখানা বিকৃত হয়ে উঠেছে, বাম হাত দিয়ে ডান হাতখানা চেপে ধরে আছে শক্ত করে। ডান হাতের মধ্যে বিদ্ধ হয়ে আছে একখানা সূতীক্ষ্ণ ছোরা। ঝর ঝর করে রক্ত ঝরে পড়ছে।

শামস হুসাইন ছোরাখানা খুলে ফেললো তার ডান হাতের কব্জা থেকে, তারপর বাম হাতখানা বাড়িয়ে দিলো আবার সেই সুইচটার দিকে।

বনহুর বুঝতে পারলো এবার শামস হুসাইনের ইচ্ছা পূর্ণ হবে। আর এক মুহূর্ত, তাহলেই তার দেহটা প্রাণহীন মাংসপিণ্ডে পরিণত হবে। কিন্তু সেই দণ্ডে রহমান কোথা থেকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো শামস হুসাইনের উপর।

রহমান আর শামস হুসাইন মিলে শুরু হলো ভীষণ ধস্তাধস্তি। শামস হুসাইন বুঝতে পেরেছে এও ঐ লোকটির সঙ্গী, তাই মরিয়া হয়ে সে লড়াই করে চললো। শামস হুসাইনের লক্ষ্য রহমানকে কাবু করে পিছন সুইচটায় হাত দেবে কিন্তু সে কিছুতেই রহমানকে কাবু করতে পারছে না।

ঠিক ঐ সময় রামসিং একটা মোটা রশি ঝুলিয়ে দেয়–সর্দার, এটা ধরে ফেলুন।

বনহুর বুঝতে পারে তার কথামত রহমান, রামসিং এরা গাড়ি নিয়ে হীরাঝিলে এসে পৌঁছে গেছে। হয়তো এটা খোদার রহম, নাহলে এতোক্ষণে তার মৃত্যু ঘটতো তাতে কোনো সন্দেহ নেই। রামসিং যে রশিটা ঝুলিয়ে দিলো বনহুর ঐ রশি ধরে ফেললো।

এদিকে শামস হুসাইন আর রহমান মিলে সেকি প্রচণ্ড লড়াই চলেছে। কেউ কাউকে পরাজিত করতে পারছে না। শামস হুসাইন জানতো না হঠাৎ এমন একটা পরিস্থিতি দাঁড়াবে। তার সাঙ্গপাঙ্গ সব নেশায় এখন বুঁদ। কে কোথায় ঢলে পড়েছে তার ঠিক নেই। তবু বারবার তাকাচ্ছে সে দরজার দিকে, কেউ যদি এসে পড়তো তার দলের লোক তাহলে এক্ষুণি বেঁচে যেতো।

শামস হুসাইনের আশা পূর্ণ হলো না, কারণ শয়তানদল তখন কে কোথায়, কোনো পাত্তা নেই কারো।

বনহুর রশি ধরে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে রামসিং রশির এক অংশ একটা থামের সঙ্গে বেঁধে ফেলে। এবার বনহুরের বিলম্ব হয় না, রশি ধরে অনায়াসে উঠে আসে বনহুর উপরে।

বনহুর উপরে এসেই প্যান্টের পকেট থেকে ক্ষিপ্রহস্তে রিভলভার বের করে উদ্যত করে ধরে শামস হুসাইনের বুক লক্ষ্য করে। কঠিন কণ্ঠে বলে বনহুর—খবরদার, নড়বে না।

শামস হুসাইনকে মুক্ত করে দিয়ে রহমান সরে দাঁড়িয়েছিলো। শামস হুসাইন এবার ভূতলশয্যা থেকে উঠে বসে। রীতিমত হাঁপাচ্ছে শামস হুসাইন। চোখেমুখে তার হিংস্রভাব ফুটে উঠেছে। ঠোঁটের এক পাশ বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

রহমানও অত্যন্ত হাঁপিয়ে পড়েছিলো। তার কপাল বেয়ে রক্ত ঝরছে।

বনহুর শামস হুসাইনের জামার কলার ধরে টেনে তুলে দাঁড় করিয়ে দেয়, তারপর রিভলভার ঠিক রেখে বলে—হীরাঝিলের চাবিকাঠি কোথায়?

শামস হুসাইন বলে উঠলো—চাবিকাঠি কোথায় আমি জানি না।

তুমি জানো না? তবে কে জানে।

জাফর হুসাইন........

সে তো এখন যমালয়ে।

আমি জানি না।

তবে তুমি কে?

বলবো না।

বনহুর প্রচণ্ড থাবায় শামস হুসাইনের গলার কাছে জামাটা ধরে ভীষণভাবে ঝাঁকুনি দেয়, তারপর বলে–বলবেনা? বড় সুবিধার লোক তুমি। সহজে না বলো কেমন করে বলাতে হয় দেখাচ্ছি......সঙ্গে সঙ্গে বজ্রতুল্য এক ঘুষি।

ঘুষি খেয়ে একটুও নড়লো না শামস হুসাইন, রিভলভারখানা তখনও তার বুকে চেপে ধরে আছে বনহুর। দাঁতে দাঁত পিষে বলে–হীরাঝিলের গভীর রহস্য তোমাকেই জানাতে হবে শয়তান। চলো, না হলে এক্ষুণি তোমাকে হত্যা করবো।

বনহুরের ঘুষি খেয়ে শামস হুসাইনের দাঁত দিয়ে রক্ত বের হলো। নাক দিয়েও রক্ত ঝরতে শুরু করলো। এগুলো সে বাধ্য ছেলের মত।

বনহুর শামস হুসাইনের পিঠে রিভলভার চেপে ধরে বললো–চলো, কোথায় চাবিকাঠি দাও।

শামস হুসাইন একবার পিছন ফিরে কট্‌মট্‌ করে তাকালো বনহুরের মুখের দিকে। তারপর এগুলো সে, এগারো তলার সিঁড়ি বেয়ে নিচে, সিঁড়ির ধাপ বেয়ে পাশাপাশি নামছিলো শামস হুসাইন আর বনহুর।

রহমান আর রামসিং তারা পিছনে, দু'জন দু'পাশে সতর্কভাবে রয়েছে। তাদের হাতেও পিস্তল আছে।

শামস হুসাইন তিন তলায় নেমে এলো।

এবার সে একটা কক্ষ দেখিয়ে বললো–এই কক্ষে চাবি রয়েছে।

বনহুর বললো–বেশ, দরজা খুলে চাবি বের করে আনো।

শামস হুসাইন তার প্যান্টের পকেট থেকে একটা চাবি বের করে দরজা খুলে ফেললো, প্রবেশ করলো সে ভিতরে। বনহুর তাকে অনুসরণ করলো।

রহমান আর রামসিং ভিতরে প্রবেশ করতে যাচ্ছিলো, বনহুর তাদের ইংগিতে বারণ করলো।

রহমান আর রামসিং অগ্রসর না হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো দরজার বাইরে।

বনহুর ভিতরে প্রবেশ করে দেখলো শামস হুসাইন ওদিকে দেয়ালের দিকে এগুচ্ছে। দেয়ালের গায়ে কতকগুলো যন্ত্রপাতি লক্ষ্য করলো বনহুর। কিন্তু চাবি কোথায়, এ কক্ষে আর কোনো আসবাব দেখা যাচ্ছে না। কক্ষটার মধ্যে ঝাপসা আলো জ্বলছে।

বনহুর কিন্তু সবসময় শামস হুসাইনের দিকে তার রিভলভার ঠিক রেখেছে। এতোটুকু বদমাইশি বা চালাকি করলে সে বনহুরের রিভলভার থেকে রক্ষা পাবে না।

হঠাৎ শামস হুসাইন একটা চাকায় হাত দিয়ে চাপা দিলো, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ঘর একরাশ ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেলো।

বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে ধূম্ররাশির মধ্যে শামস হুসাইনকে লক্ষ্য করে গুলী ছুড়লো। গুড়ুম......গুড়ুম......গুড়ুম......কোনো আর্তনাদ শোনা গেলো না।

বনহুরের মনে হচ্ছে সমস্ত ঘরখানা যেন দুলছে। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে তার। সে অতি দ্রুত নাকেমুখে রুমাল চাপ দিলো। বনহুর বুঝতে পারলো শয়তানটার চক্রান্ত এটা। ধূম্ররাশি বিষাক্ত গ্যাস ছাড়া কিছু নয়। কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছে বনহুর। চোখের দৃষ্টি ক্রমে ঝাপসা হয়ে আসছে।

বনহুর তাড়াতাড়ি উবু হয়ে শুয়ে পড়লো মেঝেতে ডান হাতে নাকমুখ চেপে ধরে।

❑

ক্রমান্বয়ে জ্ঞান ফিরে এলো বনহুরের।

চোখ খুলতেই নজরে পড়লো চারিদিকে জমাট অন্ধকারে আচ্ছন্ন। হাত পা-দেহ কিছুই নড়াতে পারছে না সে। বুঝতে পারলো তার সমস্ত শরীরে লৌহশিকল জড়ানো আছে। উঠে বসতে গেলো কিন্তু পারলো না। ধীরে ধীরে মনে পড়লো সেই ধূম্ররাশির কথা। বিষাক্ত গ্যাস ছাড়া কিছু নয়। আরও মনে পড়লো বনহুরের রহমান আর রামসিং-এর কথা। ওরাও কি তারই মত বিপদে পড়েছে, না মুক্ত আছে। কতক্ষণ সে এমন অজ্ঞান ছিলো খেয়াল নেই। কেমন যেন একটা শব্দ কানে আসছে। কেউ যেন গোঙ্গাচ্ছে বা কাতরাচ্ছে বলে মনে হলো।

হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে চোখে ধাধা লেগে গেলো বনহুরের। তীব্র ইলেকট্রিক আলো।

বনহুর ইচ্ছা করেই সংজ্ঞাহীনের মত চুপচাপ পড়ে রইলো। তবে একটু আধটু দেখতে লাগলো সে অতি সতর্কভাবে। দেখলো বনহুর, কক্ষমধ্যে

প্রবেশ করলো সেই শয়তান লোকটা। চোখেমুখে তার হিংস্রভাব ফুটে উঠেছে।

একটা উজ্জ্বল আলো জ্বলে উঠেছে, তারই তীব্র আলোরছটায় কক্ষটা ঝলমল করছে।

লোকটার সঙ্গে দু'জন বলিষ্ঠ লোক আছে। তাদের দেহে অদ্ভুত ধরনের খাকি পোশাক। লোক দুটোকে ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছে। প্রথম ব্যক্তি শামস হুসাইন এবং তার সঙ্গীদ্বয় তারই সহচর।

ওরা তিনজন এসে দাঁড়ালো বনহুরের পাশে।

বনহুর অনুভব করলো মেঝেতে একটি মোটা তক্তার সঙ্গে তার দেহটা আটকানো আছে। হাত-পা এবং দেহের সঙ্গে মজবুত করে লৌহশিকল আঁটা।

বনহুরের কানে গেলো প্রথম ব্যক্তি মানে শামস হুসাইনের কণ্ঠস্বর–দেখোতো একে চিনতে পারো কিনা?

বলিষ্ঠ জোয়ান লোক দু'জনার মধ্যে একজন ঝুঁকে পড়ে দেখলো বনহুরকে, তারপর বলে উঠলো–একে চিনবো না, এটা সেই লোক যে আমাদের মালিক জাফর হুসাইনকে হত্যা করেছে।

গর্জে উঠলো হুসাইন–কি বললে, ভাইজানকে এই নরশয়তান হত্যা করেছে?

হাঁ ছোট ওস্তাদ, এই সেই মিঃ লিয়ন।

মিঃ লিয়ন! যে বাঙ্গালী বিদেশীর ছদ্মবেশে হোটেল গুলবাগে আস্তানা গেড়েছিলো?

হাঁ, এ সেই বাঙ্গালী শয়তান।

ও, এবার বুঝতে পেরেছি কেন এ হীরাঝিলে এসেছে। বাঙ্গালী বন্দীদের উদ্ধার করতে এসে নিজেই বন্দী বনে বসেছে।

ঠিক বলেছেন ছোট ওস্তাদ। বাঙ্গালী দোস্তদের উদ্ধার করতে এসে বেটা নিজেই ফাঁদে পড়েছে। বললো শামস হুসাইনের এক সঙ্গী।

শামস হুসাইন বনহুরের দেহে পা দিয়ে লাথি মেরে বললো–শয়তান বাঙ্গালী বেটার এখনও জ্ঞান ফেরেনি দেখছি।

একজন বললো–ছোট ওস্তাদ, ওকে এই বেলা খতম করে দেই?

না, এখন নয়। বললো শামস হুসাইন।

কেন ওস্তাদ, ওকে কি বাঁচিয়ে রাখবেন? বললো–আর একজন।

শামস হুসাইন বললো—একে এতো সহজে হত্যা করবো না। জ্ঞান ফিরলে একে তিল তিল করে শাস্তি দিয়ে শেষ করবো। এখনও কিছু অনুর্ভব করবে না......

অন্যজন বললো—ঠিক বলেছেন ছোট ওস্তাদ।

শামস হুসাইন আবার বললো—একে জীবন্ত রেখে এর সামনে ওর জাতভাইদের উপর নির্যাতন চালাবো। দেখবে কেমন মজাটা!

হাঁ, সেই ভাল হবে ছোট ওস্তাদ। বললো অপরজন।

ঠিক সেই সময় আর একজন লোক সেই কক্ষে প্রবেশ করে। কুর্ণিশ জানালো সে শামস হুসাইনকে।

শামস হুসাইন বললো—কি সংবাদ জোসেফ?

আজ তিনটা যুবক পাকড়াও করে এনেছি।

মাত্র তিনটা?

এ তিনটা দশটার কাজ দেবে ছোট ওস্তাদ। বড়লোকের ছেলে, বড় খুবসুরাত আছে।

মেয়ে খুবসুরাত হলে হতো, পুরুষ ছেলে খুবসুরাত হলে কি তেমন লাভ! নিয়ে এসো......

লোকটা বেরিয়ে গেলো, একটু পরে ফিরে এলো, তার সঙ্গে তিনটা যুবক। প্রত্যেকের হাতে রশি বাঁধা। যুবক তিনজনের বিষণ্ণ বদন, চোখে অশ্রুধারা। পিছনে দু'জন রাইফেলধারী লোক।

বনহুর সব লক্ষ্য করছে।

শামস হুসাইন যুবক তিনজনকে দেখলো, খুব ভালভাবে লক্ষ্য করে দেখার পর বললো—নিয়ে যাও, এদের গোপনকক্ষে বন্দী করে রাখোগে। এদের চালান করবো বিদেশে।

বন্দী যুবক তিনজনসহ লোক দু'জন ওদের দেয়ালের দিকে এগুলো। তার সঙ্গে শামস হুসাইনও চললো। বনহুর দেখলো, দেয়ালের এক জায়গায় একটি জমকালো বোতামে চাপ দিলো শামস হুসাইন। সঙ্গে সঙ্গে দেয়ালে একটি দরজা বেরিয়ে পড়লো। সেই দরজা দিয়ে দেয়ালের ভিতরে প্রবেশ করলো লোক দু'জন, যুবক তিনটিকেও তারা সঙ্গে নেবার জন্য টানাটানি করতে লাগলো।

নিরুপায় যুবক তিনজন শেষ পর্যন্ত বাধ্য হলো তাদের সঙ্গে যেতে।

একটু পরে যুবক তিনজনকে রেখে ফিরে এলো লোক দু'জন।

শামস হুসাইন কালো বোতামটার উপর চাপ দিলো। সঙ্গে সঙ্গে দেয়ালটা যেমন ছিলো তেমনি হয়ে গেলো।

সব লক্ষ্য করলো বনহুর।

শামস হুসাইন লোক দু'টিকে লক্ষ্য করে বললো–আজ কত দিতে হবে তোমাদের?

লোক দু'জনের মধ্যে একজন বললো–তিন যুবকের জন্য তিন হাজার দিতে হবে।

এতো বেশি চাচ্ছো কেন? পাঁচশো করে দেড় হাজার দেবো।

না ছোট ওস্তাদ, তা হবে না। বহুত দূর থেকে এদের নিয়ে এসেছি। তাছাড়া এই তিন ছেলেকে আনতে গিয়ে পাঁচটা খুন করতে হয়েছে।

পাঁচটা সেতো কম হলো, কতজন দশটা খুন করে একটা মেয়েমানুষ পাকড়াও করে আনে। যাও দু'হাজার দেবো।

আচ্ছা ছোট ওস্তাদ, তাই দিন। একজন বললো।

অপর জন বললো–বড় ওস্তাদ থাকলে আমরা বেশি টাকা পেতাম। ছোট ওস্তাদ বড় কৃপণ আছে......

হাসলো শামস হুসাইন, কুৎসিত বিকৃত হাসি, তারপর বললো–মেয়েমানুষ নিয়ে এসো, বহুত টাকা দেবো......একটু থেমে নিজের সঙ্গীদের একজনকে বললো–যাও মোহসিন আলী, ওদের দু'হাজার টাকা দিয়ে দাও।

বেরিয়ে যায় মোহসিন আলী, তাকে অনুসরণ করে লোক দু'জন।

এমন সময় আর একজন লোক ভিতরে প্রবেশ করে শামস হুসাইনকে কুর্ণিশ জানিয়ে ব্যস্তকণ্ঠে বলে–ছোট সাহেব, মিস হীরা আসছেন।

শামস হুসাইনের চোখেমুখে একটা উত্তেজনার ভাব ফুটে উঠে, বললো সে–মিস হীরা আসছে?

হাঁ, ছোট সাহেব।

হঠাৎ হীরা হীরাঝিলে কেন?

বললো লোকটা–মিস হীরা জানতে পেরেছেন তার পিতৃহন্তা ধরা পড়েছে, তাই তিনি নিজে তাকে দেখতে আসছেন।

হুঁ। একটা শব্দ করলো শামস হুসাইন।

বনহুরের হাত-পা এবং সমস্ত শরীরে লৌহশিকল আটকানো থাকায় তার খুবই কষ্ট হচ্ছিলো, তবু সে স্তব্ধ নিশ্বাসে সংজ্ঞাহীনের মত সেই কক্ষের

সব কিছু লক্ষ্য করছিলো। নতুন লোকটি যখন শামস হুসাইনকে কথাগুলো বললো তখন শামস হুসাইনের মুখোভাব লক্ষ্য করলো বনহুর। মিস হীরা নামটা শুনে শামস হুসাইন যেন বেশ কিছুটা দমে গলো বলে মনে হলো তার।

শামস হুসাইন পায়াচারী করতে শুরু করলো, চোখেমুখে তার গাম্ভীর্য ভাব দেখা দিলো। বললো আবার—যাও নিয়ে এসো তাকে।

নিয়ে আসতে হবে না, আমি নিজেই এসেছি ছোট সাহেব। শুনলাম আমার বাবাকে যে হত্যা করেছে সে ধরা পড়েছে?

শামস হুসাইন একটু হেসে নিজকে সংযত করে নিয়ে বললো—ধরা পড়েনি, আমি তাকে গ্রেপ্তার করেছি।

সব শুনেছি। বিষাক্ত গ্যাস ছেড়ে তাকে ধরেছেন, দেহের শক্তিতে নয়। কোথায় সে ব্যক্তি?

শামস হুসাইন মিস হীরার কথায় ক্ষুণ্ন হলো, ক্রুদ্ধও হলো বটে তবু নিজকে সামলে রেখে ভালভাবে বললো—কে বললো এ কথা আপনাকে?

যেই বলুক, আমি শুনেছি। তাছাড়া আমি নিজেও জানি আপনি কতখানি বীর পুরুষ।

বনহুর চোখ বন্ধ করে সব শুনছে, বুঝতে পারলো মিস হীরা ছোট ওস্তাদকে তেমন তোয়াক্কা করে না। বনহুর আরও বুঝতে পেরেছে, মিস হীরা জাফর হুসাইনের কন্যা। পিতৃহন্তার গ্রেপ্তার সংবাদ পেয়েই সে হাজির হয়েছে হীরাঝিলে।

বনহুরের কানে ভেসে আসে মিস হীরার কণ্ঠ—আপনাকে যা জিজ্ঞাসা করলাম তার জবাব দিন? সে লোকটি কোথায়?

শামস হুসাইন এবার আংগুল দিয়ে বনহুরকে দেখিয়ে বললো—ঐ যে তক্তার সঙ্গে বাঁধা অবস্থায় রয়েছে।

এতোক্ষণ মিস হীরা অন্যদিকে খেয়াল করেনি। এবার সে এগিয়ে যায় বনহুর যেখানে রয়েছে সেখানে। কক্ষমধ্যে অল্প পাওয়ারের আলো জ্বলছিলো তাই সহসা নজরে পড়েনি।

মিস হীরা ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে—এখনও একে জীবিত রেখেছেন কেন?

শামস হুসাইন বললো—বিষাক্ত গ্যাসে ও জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে, কাজেই তাকে আমি হত্যার আদেশ দেইনি, কারণ ওকে দগ্ধীভূত করে তিলে তিলে হত্যা করবো।

হাঁ, আমার আব্বাকে যে হত্যা করেছে তাকে আমি কিছুতেই ক্ষমা করবো না। কথাটা বলে নিজের হাতে মিস হীরা বেশি পাওয়ারের আলোর সুইচটা টিপ দেয়। তারপর ঝুঁকে পড়ে সে বনহুরের মুখের দিকে।

বনহুর তখন নিশ্বাস-প্রশ্বাস একেবারে বন্ধ করে নিশ্চুপ মরার মত পড়ে থাকে।

মিস হীরার দু'চোখে যে আগুন ঠিকরে বের হচ্ছিলো, প্রতিহিংসার বহ্নিজ্বালায় জ্বলে পুড়ে যাচ্ছিলো সে।

শামস হুসাইনও এসে দাঁড়িয়েছে তার পাশে।

শামস হুসাইনের সঙ্গীটা দাঁড়িয়ে আছে হুকুমের প্রতীক্ষায়।

শামস হুসাইন লক্ষ্য করছে মিস হীরাকে, বললো সে–এর জ্ঞান ফিরে এলে আমি একে অগ্নিদগ্ধ করে হত্যা করবো। এ শুধু বড় ওস্তাদকে হত্যা করেনি, আমাকেও হত্যা করতে চেয়েছিলো কিন্তু আমি ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেছি।

মিস হীরা একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বনহুরের মুখখানার দিকে। ধীরে ধীরে চোখ দুটো যেন শান্ত হয়ে আসছে মিস হীরার। অবাক হয়ে গেছে সে বনহুরকে দেখে।

শামস হুসাইন তখনও বলে চলেছে–আমাকে হত্যা করে এ শয়তান হীরাঝিল অধিকার করতে চায়। আমি জীবন দিয়ে হীরাঝিলকে রক্ষা করেছি মিস হীরা।

মিস হীরা তখন তন্ময় হয়ে তাকিয়ে আছে বনহুরের মুখের দিকে। দৃষ্টি সে ফিরিয়ে নিতে পারছিলো না কিছুতেই। এতো সুন্দর সুপুরুষ লোকটা তার আব্বা জাফর হুসাইনকে হত্যা করেছে। পিতার হত্যার প্রতিহিংসা আগুন যেমন দপ করে জ্বলে উঠেছিলো, তেমনি ধীরে ধীরে নিভে গেলো। এটা নারী সুলভ মায়াময় হৃদয় জেগে উঠলো সেখানে।

শামস হুসাইন বলেই চলেছে–মিস হীরা, এর উদ্দেশ্য অতি জঘন্য ছিলো, হীরাঝিল হস্তগত করে হীরাঝিলের বন্দী সুন্দরী নারীদের সে......

এতোক্ষণে হুস হলো মিস হীরার, বললো–এর হাত-পা ও শরীরের লৌহশিকল খুলে দিন ছোট সাহেব।

মিস হীরার কথায় শামস হুসাইন অবাক হয়ে যায়, বলে উঠে–আপনার পিতৃহন্তাকে মুক্ত করে দেবো, এ কি বলছেন মিস হীরা!

এবার মিস হীরা তাকালো শামস হুসাইনের দিকে, মুখমণ্ডলে তার সেই পূর্বের হিংস্র ভাব আর নেই। স্থির কণ্ঠে বললো হীরা–সংজ্ঞাহীন মানুষকে এভাবে বেঁধে রাখা ঠিক নয় ছোট সাহেব।

আপনি জানেন না মিস হীরা, এ ভয়ঙ্কর শক্তিশালী লোক। শুধু আমাকে নয়, হীরাঝিলের সবাইকে কাহিল করে ফেলবে।

তা আপনার আচরণেই আমি বুঝতে পেরেছি ছোট সাহেব। নাহলে একটা সংজ্ঞাহীন লোককে আপনি এইভাবে লৌহশিকলে বেঁধে রাখতে পারেন! খুলে দিন, তারপর ওর জ্ঞান ফিরে এলে আমি নিজে এর বিচার করবো।

শামস হুসাইনের মুখোভাব গম্ভীর হলো। কত কষ্ট করে তবেই না একে পাকড়াও করতে সক্ষম হয়েছে সে। তাকে মুক্ত করে দেওয়া মানে বিপদ ডেকে আনা। শামস হুসাইন বললো–মিস হীরা, একে মুক্ত করে দেওয়া কিছুতেই উচিত হবে না।

এটা আপনার মনের দুর্বলতা। একটা সংজ্ঞাহীন মানুষকে বন্দী করে কেউ বীর পুরুষ হতে পারে না। আপনি একে যদি সজ্ঞানে পাকড়াও করতে সক্ষম হতেন তাহলে আমি আপনাকে পুরস্কৃত করতাম। এখন একে আপনি লৌহশিকলে আবদ্ধ রেখে কাপুরুষতার পরিচয় দিয়েছেন।

ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে শামস হুসাইন–মিস হীরা, আমি কাপুরুষ?

হাঁ।

কি বললেন?

যা সত্য তাই বলেছি। যত শত্রুই হোক না কেন, তাকে জ্ঞানহীন অবস্থায় বন্দী করা মোটেই শ্রেয় নয়।

মিস হীরার কথাগুলো বনহুরের হৃদয় স্পর্শ করলো। ওকে একবার চোখ মেলে দেখতে ইচ্ছা করছে কিন্তু উপায় নেই। শয়তান শামস হুসাইন ও তার সঙ্গী ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে আছে।

এবার বনহুরের কানে গেলো শামস হুসাইনের কণ্ঠ–মিস হীরা, ওর হাত-পা এবং দেহ থেকে লৌহশিকল খুলে দেবার নির্দেশ দিচ্ছি কিন্তু এর পরিণতি ভাল হবে না মনে রাখবেন।

পরিণতি যাই হোক পরে দেখা যাবে, আপনি এই মুহূর্তে আদেশ দিন ওকে মুক্ত করে দিতে।

বেশ, তাই দিচ্ছি। এবার সঙ্গীটিকে লক্ষ্য করে বললো শামস হুসাইন—মালিক নাসিরকে বলো ওর দেহ থেকে লৌহশিকল খুলে নিক।

সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেলো সঙ্গীটি।

শামস হুসাইন বললো—মিস হীরা, আপনার বাবা আপনাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন এবং সেই কারণেই আপনার নামে এই হীরাঝিল তৈরি করেছিলেন......

এ সব আমি জানি ছোট সাহেব।

তাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি সেই পিতাকে হত্যা করে হীরাঝিল যে ব্যক্তি অধিকার করতে চেয়েছিলো তাকে আপনি মুক্তি দিচ্ছেন কিন্তু......

কোনো কিন্তু আমি শুনতে চাই না ছোট সাহেব। কারণ আমি যা বুঝি তাই হবে। হাঁ, আর একটি কথা, আজ থেকে পিতার বদলে আমি হীরাঝিলের দায়িত্বভার নিলাম।

মিস হীরা, আপনি ছেলেমানুষ হয়ে......

সব পারবো তবে আপনি আমার সঙ্গে থাকবেন।

বনহুর এই মুহূর্তে একটু তাকিয়ে দেখে নিলো মিস হীরা ও শামস হুসাইনের মুখমণ্ডলটা। দেখলো মিস হীরার কথায় শামস হুসাইনের মুখ কালো হয়ে উঠেছে।

ঐ সময় কক্ষমধ্যে প্রবেশ করলো শামস হুসাইনের সঙ্গীটি, তার সঙ্গে আরও কয়েকজন লোক।

শামস হুসাইন এবং মিস হীরাকে কুর্ণিশ জানিয়ে বললো একজন—ছোট সাহেব, বন্দীর বন্ধন খুলে দেবার জন্য নাকি আদেশ দিয়েছেন?

শাসম হুসাইন কিছু বলবার পূর্বেই বললো মিস হীরা—হাঁ মালিক নাসির, তুমি বন্দীর বন্ধন মুক্ত করে দাও।

শামস হুসাইন মুখ গম্ভীর করে রইলো।

মালিক নাসির এবার বনহুরের দেহ থেকে লৌহশিকলের তালাগুলো চাবি দিয়ে খুলে দিতে লাগলো।

মিস হীরা তখন নির্নিমেশ নয়নে দেখছিলো বনহুরকে।

বন্ধন মুক্ত করে দেওয়া হলো।

বনহুর তখনও মরার মত পড়ে রয়েছে।

মিস হীরা বললো–এবার তোমরা বেরিয়ে যাও। যতক্ষণ না এর সংজ্ঞা ফিরে আসে ততক্ষণ তোমরা কেউ এ কক্ষে আসবে না।

মিস হীরার আদেশক্রমে সবাই বেরিয়ে যায়।

শামস হুসাইনের মুখমণ্ডলে একটা প্রতিহিংসার ভাব ফুটে উঠে। ক্রুদ্ধ পদক্ষেপে বেরিয়ে যায় সে।

মিস হীরা এগিয়ে যায় বনহুরের পাশে, উবু হয়ে তার চিবুকে হাত স্পর্শ করে বলে–কে তুমি অজানা পুরুষ, আমাকে তুমি মুগ্ধ করলে!

অবশ্য মিস হীরাও অবাঙ্গালী, কথাবার্তা সেও উর্দুতে বলছিলো।

বনহুর রুদ্ধ নিশ্বাস নিশ্চুপ থেকে সব লক্ষ্য করতে লাগলো। মিস হীরা যে তার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আরও কিছুক্ষণ ধৈর্য ধরার জন্য বনহুর প্রস্তুত হয়ে নিয়েছে।

মিস হীরা বনহুরের কপাল ও গণ্ডে হাত বুলিয়ে চলেছে। চুলগুলো সরিয়ে দিলো সে ওর কপাল থেকে কোমল হস্তের স্পর্শে বনহুরের ব্যথা অনেকখানি যেন কমে গেলো। নিশ্চিন্তও হয়েছে সে অনেক, কারণ এখনও তার হাত-পা-শরীর মুক্ত।

মিস হীরাকে এই মুহূর্তে সে কাবু করে সরে পড়তে পারে কিন্তু সে আরও কিছুক্ষণ দেখতে চায় মিস হীরার শেষ অভিরুচি কি।

মিস হীরা তখন বনহুরের চিবুক এবং সমস্ত মুখমন্ডলে নিজের রুমালখানা বুলিয়ে পরিষ্কার করে দিচ্ছিলো। একটু পরে উঠে দাঁড়ালো মিস হীরা, তারপর হাতে তালি দিলো।

সঙ্গে সঙ্গে দু'জন জোয়ান লোক প্রবেশ করলো সেই কক্ষে। মিস হীরাকে ওরা দু'জন কুর্ণিশ জানিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

মিস হীরা বললো–তোমরা দু'জন এই কক্ষে এর পাহারায় থাকবে। যখন জ্ঞান ফিরবে তখনই আমাকে ডাকবে। আমি বিশ্রামাগারে যাচ্ছি।

লোক দু'জনের মধ্যে একজন বললো–আচ্ছা মা-জী, আমরা এখানে পাহারায় রইলাম।

হাঁ, সতর্ক থাকবে, জ্ঞান হলেই আমাকে জানাবে। কথাটা বলে বেরিয়ে গেলো মিস হীরা।

বনহুর দেখলো, পাহারাদার লোক দু'জন খুব সতর্কভাবে তার দু'পাশে এসে দাঁড়ালো।

এক মিনিট, দু'মিনিট, তিন মিনিট......কয়েক মিনিট কেটে গেলো। বনহুর তাকিয়ে দেখলো পাহারাদার দু'জন ঠিক সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে, হাতে তাদের সূতীক্ষ্ণ ধার বর্শা।

বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে উঠে দাঁড়ালো। দু'জন পাহারাদারকে দু'হাতে চেপে ধরে ভীষণ জোরে চাপ দিলো ওদের গলায়। মাত্র একটু গোঙ্গানির ক্ষীণ আওয়াজ, তারপর দু'জনের সংজ্ঞাহীন দেহ ঢলে পড়লো বনহুরের দু'বাহুর মধ্যে।

এবার বনহুর পাহারাদার দু'জনকে আলগোছে শুইয়ে দিলো সেই তক্তাখানার উপর। পাশেই পড়ে ছিলো ঐ শিকলগুলো, যে শিকলে বাঁধা ছিলো বনহুরে হাত-পা আর শরীরটা।

বনহুর ঐ শিকলগুলো দিয়ে পাহারাদার দু'জনকে মজবুত করে বেঁধে ফেললো, তারপর সে সোজা দেয়ালের জমকালো চাক্তিটার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে দেখলো পকেট ফাঁকা, এমন কি তার ছদ্মবেশের দাড়ি-গোঁফ জোড়াও নেই। রিভলভারটা তো তার হাতে ছিলো, ওটার তো কথাই নেই। বনহুর একটু ভেবে নিলো তারপর পাহারাদারদের একটি বর্শা সে তুলে নিলো হাতে।

এবার বনহুর জমালো গোলাকার চাক্তিটায় আংগুল দিয়ে চাপ দিলো।

সঙ্গে সঙ্গে দেয়ালটা যাদুবিদ্যার মত একপাশে সরে গেলো। বেরিয়ে এলো একটি দরজা।

বনহুর কালবিলম্ব না করে বর্শা হাতে সেই দরজাপথে ভিতরে প্রবেশ করলো। সুন্দর সিঁড়ির ধাপ নেমে গেছে নিচের দিকে।

বনহুর নেমে চললো।

কেউ বাধা দিলো না তাকে।

বেশ কিছুদূর চলার পর দেখলো সিঁড়ির মুখ কয়েক ভাগে বিভক্ত হয়ে এদিক-সেদিক চলে গেছে। বনহুর ভেবে নিলো এখন কোন্ দিকে যাবে সে।

মাত্র কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে ভাবলো, তারপর এগুলো সে দক্ষিণ দিকের পথ বেয়ে। বেশিদূর যেতে হলো না, হঠাৎ কাতরানির শব্দ কানে এলো তার। সামনে তাকিয়ে দেখলো বনহুর একটি ছোট খুপরির মত কুঠরিতে প্রায় পঞ্চাশজনলোক বসে-দাঁড়িয়ে অসহ্য যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে।

সবাইকে এক-একটা রশি দিয়ে পিছমোড়া করে বেঁধে রাখা রয়েছে। ভাল করে লক্ষ্য করলো বনহুর, এই ছোট খুপরিটার মধ্যে নারী-পুরুষ সব রকম আছে। এটা যেন মুরগীর খুপরি।

বনহুরকে ওরা দেখে ফেলেছিলো, একজন বললো-আমাদের মারবে? এর চেয়ে মেরে ফেলো, একসঙ্গে সবাই মরে বেঁচে যাই।

যে লোকটা বনহুরকে দেখে কথাগুলো বললো সে বেশ বয়সী বলে মনে হলো।

লোকটা অসহায় চোখে তাকিয়ে আছে।

বনহুর অনুভব করলো তাকে ওরা ভুল বুঝছে। সে আরও কিছুটা এগুলো সামনের দিকে।

মশাল জ্বলছে।

তারই আলোতে সুড়ঙ্গপথ আলোকিত।

কুঠরিটার মধ্যে সম্পূর্ণ দেখা না গেলেও যেটুকু দেখা যাচ্ছে তাতেই ভিতরটার অবস্থা বেশ বুঝতে পারছে বনহুর। হায়রে অসহায় বাঙ্গালী, তোমরা আর কতদিন এমন কি করে মৃত্যুর প্রহর গুণবে!

এগিয়ে গেলো বনহুর।

যে লোকটা বনহুরকে লক্ষ্য করে কথাগুলো বলেছিলো সেই আবার বললো-তোমাকে তো ওদের মানুষ বলে মনে হচ্ছে না। তুমি কি তাহলে এদের লোক নও?

বনহুর আরও এগিয়ে এসেছে।

খুপরির মধ্য থেকে সবাই তাকিয়ে দেখছে বনহুরকে। বনহুর সরে এসে সেই বয়স্ক লোকটার সামনে দাঁড়ালো।

ও বললো-তুমিও কি আমাদের মত বন্দী? তুমিও কি বাঙ্গালী?

বনহুর বললো-বাঙ্গালী কিন্তু বন্দী নই।

তবে কি করে এলে এই দুর্গম সুড়ঙ্গমধ্যে?

বললো বনহুর-বাঙ্গালী বলে বাঙ্গালী উদ্ধারে এসেছি।

মুহূর্তে খুপরির মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ জোড়া চোখ মুক্তির আনন্দে দীপ্ত হয়ে উঠলো। সবাই খুপরি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আকুলি বিকুলি করছে। সবাই হাত বাড়াচ্ছে বনহুরের দিকে।

বনহুর তাকিয়ে দেখছে কত যন্ত্রণাময় অবস্থায় আছে ওরা। হাওয়াবিহীন কবরের অন্ধকারে ভরা খুপরিটা। বনহুর বললো, তোমরা প্রস্তুত থেকো আমি ফিরে এসে যা বলবো সেই মত কাজ করবে।

সবাই আশাদীপ্ত মুখে বললো–হাঁ, আমরা তোমার কথামতই কাজ করবো।

বনহুর এবার দ্বিতীয় পথ ধরে এগিয়ে চললো। এটাও একটি সুন্দর সুড়ঙ্গপথ। কিছুদূরে এগিয়ে যে দৃশ্য বনহুরের নজরে পড়লো সে এক করুণ মর্মবিদারক দৃশ্য। কতকগুলো হাড় জিরজিরে কঙ্কালসার মানুষ বসে বসে মৃত্যুর প্রহর গুণছে। কোটরাগত চোখ, রুক্ষ চুল, ছিন্নভিন্ন বসন।

বনহুরকে দেখে ওরা দাঁড়াতে চেষ্টা করলো কিন্তু এতো দুর্বল যার জন্য তারা দাঁড়াতে পারলো না। এ-ওর গায়ে পড়ে গেলো হুমড়ি খেয়ে।

বনহুর এসে ধরে ফেললো একজনকে, সে অতি বৃদ্ধ এবং দুর্বল ছিলো।

বৃদ্ধটা বললো–বাবা কে তুমি?

বনহুর বৃদ্ধকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো–আমি একজন বাঙ্গালী। আমি এসেছি আপনাদের উদ্ধার আশায়।

বৃদ্ধের চোখ দুটো খুশিতে জ্বলে উঠলো।

ঐ মুহূর্তে সুড়ঙ্গপথে দ্রুত পদশব্দ শোনা গেলো। ভারী জুতোর শব্দ, মনে হলো এদিকেই এগিয়ে আসছে।

বনহুর ক্ষিপ্রগতিতে একটু আড়ালে আত্মগোপন করে ফেললো। এখনও তার ডান হাতে সূতীক্ষ্ণ ধার বর্শাখানা ধরা রয়েছে।

বনহুর দেখলো শামস হুসাইন ও আরও দু'জন জোয়ান লোক এগিয়ে আসছে। দু'জন লোকের হাতে দু'টি মশাল।

মশালের আলোতে তার মুখোভাব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে এক একজনের চোখ দিয়ে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হচ্ছে।

বনহুর প্রস্তুত হয়ে নিলো।

ওরা তিনজন এগিয়ে আসছে।

সর্বপ্রথম রয়েছে শামস হুসাইন, হাতে তার উদ্যত রাইফেল।

পিছনে তার সঙ্গীদ্বয়, হস্তে বৃহদাকায় সূতীক্ষ্ণ ধার ছোরা।

বনহুর নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে আছে, হাতে তার বর্শা।

ওদিকে বন্দী বাঙ্গালীরা ভয়বিহ্বল চোখে তাকাচ্ছে। একটা বিরাট কিছু ঘটতে যাচ্ছে, তারই জন্য প্রতীক্ষা করছে ওরা।

বৃদ্ধ বনহুরকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। বনহুর কে তা সে জানে না, জানে লোকটা তাদের উদ্ধার করতে এসেছিলো। তাদের বাঁচাতে এসে বিপদে পড়লো লোকটা। বৃদ্ধের হৃদয় ব্যথায় মুষড়ে পড়ছিলো। খোদা যদি ওকে রক্ষা করেন তাহলে সে খুব খুশি হতো।

শুধু বৃদ্ধ নয়, সেই কক্ষের জীর্ণশীর্ণ বন্দী নারী-পুরুষ সবাই উদগ্রীব হয়ে উঠেছে। নতুন একটা ঘটনা তাদের সম্মুখে ঘটতে যাচ্ছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বৃদ্ধ দাঁড়াতে পারছিলো না, তবু দেয়ালে ভার দিয়ে প্রতীক্ষা করছে একটা চরম অবস্থার জন্য।

ঠিক ঐ মুহূর্তে শামস হুসাইন শিকারী কুকুরের মত সোজা এগিয়ে আসছিলো।

আড়াল থকে বনহুর তার বর্শা নিয়ে শামস হুসাইনের হাতের উপর প্রচণ্ড আঘাত করলো। সঙ্গে সঙ্গে শামস হুসাইনের হাত থেকে রাইফেলটা পড়ে গেলো ছিটকে কিছু দূরে।

একদণ্ড সে থমকে দাঁড়িয়ে বাম হাতে ডান হাতখানা চেপে ধরলো, মুখখানা তার ক্রুদ্ধ শৃগালের মত কুৎসিত হয়ে উঠলো।

পিছনের লোক দু'টিও অল্পক্ষণের জন্য হতভম্ভ হয়ে পড়লো।

শামস হুসাইন নিজেকে সামলে নিয়ে চিৎকার করে সঙ্গীদের বললো—হা করে কি দেখছো কাপুরুষের দল......

শামস হুসাইনের কথা শেষ হয় না, আড়াল থেকে বনহুর হিংস্র সিংহের মত ঝাঁপিয়ে পড়লো তার উপর।

শামস হুসাইন টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেলো মাটিতে।

শামস হুসাইন পড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্গীদ্বয় ছোরা নিয়ে আক্রমণ করলো বনহুরকে।

বনহুর মুহূর্তে ঘুরে দাঁড়িয়ে তার হাতের বর্শার আঘাতে একজনকে ধরাশায়ী করলো।

যে লোকটা ধরাশায়ী হলো তার হাতের ছোরাখানা ঠিক শামস হুসাইনের পাশে গিয়ে পড়লো। শামস হুসাইন সেই ছোরাখানা নিয়ে পুনরায় আক্রমণ করলো বনহুরকে।

বনহুর চট করে সরে দাঁড়ালো।

হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো আবার শামস হুসাইন। ঠিক ঐ সময় দ্বিতীয় ব্যক্তি ছোরা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো বনহুরের উপর।

বনহুর খপ খরে ছোরাসহ লোকটার হাতখানা ধরে ফেললো। ভীষণ চাপ দিতেই ওর হাত থেকে ছোরাখানা খসে পড়লো। বনহুর প্রচণ্ড এক লাথি মারলো ওর তলপেটে, সঙ্গে সঙ্গে হুমড়ি খেয়ে পড়লো লোকটা তারই হাত থেকে পড়ে যাওয়া ছোরাখানার উপর।

একটা তীব্র আর্তনাদে সুড়ঙ্গপথটায় প্রতিধ্বনিত হলো। লোকটার বুকে ছোরাখানা আমূল বিদ্ধ হয়েছে।

একটু পূর্বে যে লোকটা বনহুরের বর্শার আঘোতে পড়ে গিয়েছিলো, সে উবু হয়ে ছিলো–এবার যন্ত্রণায় চীৎ হয়ে মুখখানা বিকৃত করলো, অমনি এক ঝলক রক্ত গড়িয়ে পড়লো মুখ গহ্বর থেকে।

শামস হুসাইন একবার ফিরে তাকালো ছোরাবিদ্ধ অনুচরটির দিকে, তারপর বর্শাবিদ্ধ লোকটার মুখে। সঙ্গীদের অবস্থা দর্শন করে মুখ কালো হয়ে উঠলো শামস হুসাইনের। মুহূর্ত বিলম্ব না করে শামস হুসাইন পিছু হটে পালাতে লাগলো।

বনহুর তাকে অনুসরণ করলো।

ছুটতে শুরু করেছে শামস হুসাইন, প্রাণপণে ছুটছে। যেমন করে হোক বাঁচতে হবে। হীরাঝিলের মায়া সে মরলেও ত্যাগ করতে পারবে না।

শামস হুসাইন সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে হঠাৎ যেন অদৃশ্য হয়ে গেলো।

বনহুর আবার এসে দাঁড়ালো সেই কক্ষে যে কক্ষে তাকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় হাত-পা-শরীর শিকলে বেঁধে মেঝেতে তক্তার উপর ফেলে রাখা হয়েছিলো।

মুহূর্ত দাঁড়িয়ে ভেবে নিলো বনহুর, ওদিকে একটি দরজা দেখা যাচ্ছে। বনহুর সেই দরজা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলো। দেখলো একটি লিফট ঘর সেটা।

বনহুর দ্রুত লিফটে চেপে বসলো।

সঙ্গে সঙ্গে একটা অন্ধকারময় কক্ষে এসে থামলো লিফটটা। বনহুর কক্ষমধ্যে নেমে দাঁড়ালো, ঠিক ঐ সময় তার কানে গেলো নারীকণ্ঠ......আমি তোমাকে চাবিকাঠি দেবো না শয়তান।

শামস হুসাইনের গলা......চাবিকাঠি দেবে না মিস হীরা?

না!

তাহলে তোমাকে খুন করবো।

খুন করবে আমাকে?

হাঁ, তুমি যদি চাবিকাঠি না দাও...

বনহুর কান পেতে শুনছিলো কথাগুলো, সে বুঝতে চেষ্টা করছিলো কথাবার্তা কোন দিক থেকে আসছে। অল্পক্ষণেই তার কানে গেলো আবার সেই কণ্ঠ......হীরা, তুমি ঐ শয়তানটাকে মুক্ত করে ভালো করোনি! আমি জানতাম সে সংজ্ঞালাভ করে ভীষণ আকার ধারণ করবে......

হীরার চঞ্চল কণ্ঠ......সে জ্ঞান লাভ করেছে সে কথা এখনও বলোনি কেন?

আর একটু অপেক্ষা করো, সমস্ত হীরাঝিল সে দখল করে নেবে। এই মুহূর্তে চাবিকাঠি দাও, আমি সরে পড়ি তাহলে হীরাঝিলের চাবিকাঠি সে পাবে না। দাও, চাবিকাঠি দাও...

না, দেবো না।

তাহলে মরবে।

মরতে ভয় করি না শয়তান...

তাই নাকি? তবে প্রস্তুত হয়ে নাও মিস হীরা...দাঁতে দাঁত পিষে বললো শামস হুসাইন।

ঠিক সেই সময় বনহুর গিয়ে দাঁড়ালো তার পিছনে। সে দেখতে পেলো শামস হুসাইন মিস হীরার গলাটা দু'হাতে টিপে ধরেছে।

মিস হীরার চোখ দুটো গোলাকার হয়ে উঠেছে। জিভটা বেরিয়ে এসেছে মুখের ভিতর থেকে—আর এক মিনিট, তাহলেই মিস হীরার প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বনহুর ঝাঁপিয়ে পড়লো পিছন থেকে শামস হুসাইনের উপর, পিছনের জামাসহ ঘাড়খানা বজ্রমুষ্ঠিতে চেপে ধরলো। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড এক ঘুষি বসিয়ে দিলো বনহুর তার চোয়ালে।

মাত্র এক দণ্ড, হাতখানা ওর শিথিল হয়ে এলো। মিস হীরাকে মুক্ত করে দিয়ে ফিরে দাঁড়ালো শামস হুসাইন, আক্রমণ করলো সে বনহুরকে।

বনহুর ওকে সুযোগ না দিয়ে পুনরায় ঘুষির পর ঘুষি লাগিয়ে চললো। তাল সামলাতে পারলো না শামস হুসাইন, পালাতে গেলো সে আবার, কিন্তু বনহুর ওকে পালাবার সুযোগ দিলো না, বলিষ্ঠ হাতের মুঠায় চেপে ধরলো ওর কলারখানা।

তখন শামস হুসাইনের নাকমুখ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

বনহুর যখন শামস হুসাইনকে কাহিল করে ফেলেছে তখন মিস হীরা বিস্ময় নিয়ে দেখছে ওকে। কে এই শক্তিশালী বীর পুরুষ যে শয়তান শামস হুসাইনকে কাহিল করতে পারে!

বনহুরের তখন হিতাহিত জ্ঞান ছিলো না, সে ঘুষির পর ঘুষি চালিয়ে চলেছে। শামস হুসাইন এক মুহূর্তের জন্য টাল সামলে উঠতে পারলো না, উঠে দাঁড়াতে না দাঁড়াতে আবার হুমড়ি খেয়ে পড়লো। বনহুর দক্ষিণ পা দিয়ে শামস হুসাইনের গলা চেপে ধরলো, ভীষণ জোরে চাপ দিলো সে।

শামস হুসাইনের মুখ গহ্বর থেকে গোটা জিভটা বেরিয়ে এল, চোখ দুটো ঠিকরে বের হচ্ছে যেন। বনহুর একবার তাকালো হীরার মুখের দিকে, বললো–বলুন একে শেষ করে দেবো না প্রাণে বাঁচিয়ে রাখবো!

এবার হীরা কথা বললো—ওকে শেষ করে দিন।

বনহুর আরও জোরে চাপ দিলো, সঙ্গে সঙ্গে একটা ঘড় ঘড় আওয়াজ বের হলো শামস হুসাইনের কণ্ঠ থেকে, তারপর সব চুপ হয়ে গেলো।

বনহুর শামস হুসাইনের গলা থেকে পা সরিয়ে নিলো।

শামস হুসাইনের বলিষ্ঠ বিশাল দেহটা চীৎ হয়ে পড়ে রইলো। ওর মুখগহ্বর থেকে ফেনাযুক্ত রক্ত গড়িয়ে পড়তে লাগলো।

একদৃষ্টে শামস হুসাইনের মুখে তাকিয়ে আছে মিস হীরা।

বনহুর সরে এসে দাঁড়ালো মিস হীরার সম্মুখে। যেন কিচ্ছু ঘটেনি, এমনিভাবে বলে বনহুর–মিস হীরা, অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে।

অবাক চোখে তাকালো হীরা বনহুরের মুখের দিকে।

বনহুর বললো আবার—তখন আপনার দয়ায় আমার জীবন রক্ষা পেয়েছে মিস হীরা।

অপরিচিতি ব্যক্তির মুখে নিজের নাম শুনে অবাক হলো হীরা, আরও অবাক হলো লোকটা তো তখন সংজ্ঞাহীন ছিলো, সে কি করে জানলো তার আদেশেই ওর দেহ থেকে লৌহশিকল খোলা হয়েছে। হীরা দু'চোখে বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে আছে!

বনহুর বললো—আপনার পিতাকে হত্যা করেছি এ জন্য আমি ক্ষমা চাই।

এবার মিস হীরার মুখ গম্ভীর হলো, বললো—আমার বাবার হত্যার জন্য আমি দুঃখিত বটে, কিন্তু.....

বলুন থামলেন কেন?

হীরা একটু থেমে আবার বলতে শুরু করলো—আমার বাবার মৃত্যুতে আমি যেমন দুঃখিত, তেমনি খুশিও হয়েছি......

বনহুর বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললো—আপনি আপনার বাবার মৃত্যুতে খুশি হয়েছেন?

হাঁ।

আপনার বাবার প্রতি,তাহলে......

এখানে দাঁড়িয়ে সে সব কথা বলা চলে না। আপনি যদি আমার সব কিছু জানতে চান তা হলে আমি বলতে রাজি আছি। হীরা আংগুল দিয়ে শামস হুসাইনের মৃতদেহটা দেখিয়ে বলে—ঐ শয়তানটাই আমার বাবাকে অমানুষ করে তুলেছিলো। ওকে হত্যা করে আপনি শুধু আমাকেই মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচাননি, বহু মানুষকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছেন। তাই আমি আপনাকে খুশি করবো......

খুশি! আমাকে আপনি খুশি করবেন?

হাঁ। যা চাইবেন তাই দেবো। চলুন...মিস হীরা এগুলো।

বনহুর হীরাকে অনুসরণ করার সময় একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নিলো শামস হুসাইনের বিকৃত মুখটা।

❑

হীরা আর বনহুর এগিয়ে চলেছে।

অবাক হয়ে দেখছে বনহুর, এতোবড় হীরাঝিল সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ, শব্দ হীন। সুন্দর ঝকঝকে লম্বা টানা বারান্দা বেয়ে ওরা দু'জন এগুচ্ছে।

বনহুর বললো–সবাই গেলো কোথায়?

হীরা থমকে দাঁড়িয়ে বললো–সবাই আছে কিন্তু আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত কেউ বাইরে আসবে না।

যাক, তাহলে কিছুক্ষণের জন্য আমি নিশ্চিন্ত?

কিছুক্ষণ নয়, আপনি সর্বক্ষণের জন্য নিশ্চিন্ত। এখন আমিই এই হীরাঝিলের একমাত্র অধিকারী। কারণ আমার বাবার মৃত্যুর পর ঐ শয়তান শামস হুসাইন হীরাঝিলের সবকিছু অধিকার করে বসেছিলো। হীরাঝিলের চাবিকাঠি ছিলো তারই হাতে, তাই হীরাঝিলের সমস্ত কিছু ছিলো তারই আয়ত্তে। এখন চাবিকাঠি আমার হাতে। ......চলুন সব বলবো আপনাকে।

বনহুর বললো–তাই চলুন।

মিস হীরার সঙ্গে এগুতে এগুতে ভাবছে বনহুর অনেক কিছু। যা চেয়েছিলো তাই হলো। মিস হীরাকে এখন আয়ত্তে আনতে পারলেই সবকিছু সমাধা হবে। মনে মনে বনহুর খোদাকে অশেষ ধন্যবাদ জানালো।

একটা ঘরে এসে থামলো হীরা।

বনহুরও হীরার পিছনে পিছনে সেই ঘরে প্রবেশ করলো।

অবাক হলো বনহুর, ঘরখানা সুন্দর করে সাজানো। কিন্তু সাধারণ আসবাবপত্রে নয়, কতকগুলো তৈলচিত্র দিয়ে সাজানো। এক একটি তেলচিত্রের ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে সহসা দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারলো না বনহুর।

হীরা গম্ভীর কণ্ঠে বললো–ঐ যে দেখছেন ওটা আমার দাদু। আর ঐ যে দেখছেন ওটা আমার দাদুর ছোট ভাই। ওটা আমার বড় চাচার তৈলচিত্র। এটা আমার ছোট চাচা, আরও এই যে এ তৈলচিত্রটা হলো আমার বাবার......

হাঁ, আমিই তাকে হত্যা করেছি মিস হীরা।

হীরার মুখমণ্ডলে একটা বিষণ্নতার ছাপ ফুটে উঠলো। একটু নিশ্চুপ থেকে বললো–বাবার হত্যার কথা মনে হলে ব্যথা পাই সত্য কিন্তু খুশিও লাগে। ও, এতোক্ষণ আপনাকে বসতে বলা হয়নি। একটা আরাম কেদারা দেখিয়ে দিয়ে বলে মিস হীরা–বসুন।

বনহুর কোনো দ্বিধা না করে বসে পড়লো। শরীরটা এলিয়ে দিলো সে নরম তুলতুলে আরাম কেদারাটায়। ক'দিন সে এমন নরম কেদারায় বসেনি।

হীরা পাশের সোফায় বসলো।

উভয়ে কিছুক্ষণ নীরব।

বনহুরের জামাকাপড় ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে অনেক জায়গায়। কপালের পাশে সামান্য কেটে গিয়েছিলো এখনও রক্ত ঝরছে। চুলগুলো এলোমেলো। বনহুর নিজের আংগুল দিয়ে চুলগুলো ঠিক করে নিলো। বনহুর পকেট হাতড়ে দেখে নিলো তার পকেটে সিগারেট কেস বা ম্যাচবাক্স আছে কিনা!

মিস হীরা বুঝতে পারলো সে পকেট হাতড়ে কিসের অন্বেষণ করছে। উঠে গিয়ে টেবিলের ড্রয়ার খুলে বের করলো একটা দামী সিগারেটের টিন এবং একটি দিয়াশলাই।

এগিয়ে ধরলো হীরা সিগারেটের টিন আর দিয়াশলাই–নিন পান করুন। নিজেও সে টিন থেকে একটা সিগারেট তুলে নিলো। হেসে বললো–আমি কিন্তু সিগারেট পান করি।

বনহুর অবাক হলো না, কারণ সে বহু নারীকে সিগারেট পান করতে দেখেছে। এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই।

হীরা নিজের সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে দিয়াশলাইয়ের কাঠিটা এগিয়ে ধরলো বনহুরের দিকে।

বনহুর ততক্ষণে টিন থেকে একটা সিগারেট তুলে নিয়ে ঠোঁটের ফাঁকে গুঁজে দিয়েছে। হীরার হাত থেকে নিজের সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করলো বনহুর, একটু হেসে বললো–ধন্যবাদ।

হীরা একমুখ ধূঁয়া ছুঁড়ে দিয়ে বললো–পরদেশী, এবার আমি তোমাকে সব কথা বলবো।

বনহুর এবার একটু অবাক হলো, একেবারে সোজা 'তুমি' বলে সম্বোধন করে বসেছে তাকে হীরা। ভ্রূকুঞ্চিত করে বললো বনহুর-আপনি সব কিছু বলবেন আমি সে রকমই আশা করি।

হীরা বেশ কিছুক্ষণ একমনে সিগারেট পান করে চলে। ললাটে তার গভীর চিন্তারেখা ফুটে উঠেছে।

বনহুর তীক্ষ্ণ নজরে লক্ষ্য করতে থাকে হীরার মুখোভাব।

হীরা হঠাৎ হেসে উঠে উচ্ছ্বলভাবে, তারপর হাসি বন্ধ করে বলে-পরদেশী, তুমি আমার বাবাকে খুন করেছো তবু তোমাকে আমি ক্ষমা করেছি। তোমাকে নৃশংস হত্যা থেকে রক্ষা করেছি কেন জানো?

না, জানিনা কেন আপনি আমার প্রতি এতো মেহেরবান হয়েছেন?

শুধু তোমাকে আমার ভাল লেগেছে বলে।

এই সামান্য ভাল লাগার জন্য আপনি পিতৃহন্তাকে......

হাঁ, আমি ক্ষমা করে দিয়েছি। বিশ বছর ধরে আমি তোমার প্রতীক্ষা করছিলাম পরদেশী......

বিশ বছর ধরে? বনহুরের দু'চোখে বিস্ময় ফুটে ওঠে।

হীরা তার আংগুলের ফাঁক থেকে সিগারেটটা অ্যাসট্রের মধ্যে গুঁজে রেখে সোজা হয়ে বসে বলে-হাঁ, হঠাৎ তোমাকে পেলাম পরদেশী। তুমি যে আমার......

মিস হীরা!

সত্যি বলছি, তোমাকে আমি হত্যা করার উদ্দেশ্যেই সেদিন গোপন কুঠরিতে গিয়েছিলাম। তখন আমার মনে ছিলো পিতৃহত্যার প্রতিহিংসার তীব্র জ্বালা। কিন্তু তোমাকে দেখার পর আমার সমস্ত হৃদয় যেন অনাবিল এক আনন্দে ভরে গেলো। তোমার সংজ্ঞাহীন মুখখানা আমাকে অভিভূত করে ফেললো। আমি ভুলে গেলাম পিতৃহত্যার প্রতিহিংসা......

বনহুরের ঠোঁটের ফাঁকে একটা মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠলো।

হীরা তখন বলে চলেছে-শামস হুসাইনকে আমি আদেশ দিলাম তোমাকে মুক্ত করে দেওয়ার জন্য। আমি তখন জানতাম না তুমি সরে পড়বে। কারণ একটু পরে গিয়ে দেখি তুমি নেই......

বনহুর বললো-মিস হীরা, আপনি জানেন না আমি কি উদ্দেশ্য নিয়ে হীরাঝিলে এসেছি।

আমি জানি তুমি কেন হীরাঝিলে এসেছো।

না, আপনি জানেন না। জানলে আমাকে কিছুতেই আপনি ক্ষমা করতে পারতেন না।

বিশ্বাস করো আমি জানি। আমার কাছে তুমি নতুন নও পরদেশী।

তার মানে?

একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলো হীরা, একটা ব্যথাকরুণভাবে আচ্ছন্ন করে ফেললো তার গোটা মুখটাকে।

বনহুর কোনো কথা না বলে হীরার জবাবের প্রতীক্ষা করতে লাগলো।

হীরা আবার গা এলিয়ে দিলো আরাম কেদারাটার বুকে। দূরদৃষ্টি মেলে তাকালো সে হীরাঝিলের জানালা দিয়ে নীল আকাশের দিকে। একসময় বলে উঠলো–তোমার নাম মিঃ লিয়ন তাও জানি।

এবার বনহুর যেন চমকে উঠলো ভীষণভাবে।

হাসলো হীরা, সে হাসি যেন অতি রহস্যময় বলে মনে হলো বনহুরের কাছে। তবু নীরবে সে অপেক্ষা করতে লাগলো হীরা এরপর কি বলে।

হীরা হাসিভরা মুখেই বললো–তুমি হোটেল গুলবাগের এগারো তলার পাঁচ নম্বর ক্যাবিনে থাকতে চাও জানি।

এবার বনহুর কথা বললো–শুধু তাই নয় মিস হীরা, আপনি আরও জানেন। আমি সেখানে কি উদ্দেশ্যে ছিলাম নিশ্চয়ই......

বনহুরের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললো হীরা–হাঁ, তাও জানি।

সত্যি বলছেন?

হাঁ মিঃ লিয়ন।

না, আপনি আমাকে 'পরদেশী' বলেই ডাকবেন।

নিজের নাম গোপন করতে চাইলেও নিজকে গোপন করা যায় না লিয়ন। জানি তুমি খুব অবাক হচ্ছো আমি তোমার সম্বন্ধে এতো জানলাম কি করে?

হাঁ, আমার মনে বিরাট প্রশ্ন জেগেছে।

তুমি অপেক্ষা করো, আমি তোমার মনের দ্বন্দ্ব দূর করবো।

উঠে গেলো হীরা, একটু পরে ফিরে এলো, হাতে তার একটি ফটো রয়েছে। ফটোটা বনহুরের সম্মুখে তুলে ধরে বললো–একে চিনতে পারো?

দু'চোখে বিস্ময় ফুটে উঠলো বনহুরের, অস্ফুট শব্দ করলো সে–শাম্মীর ছবি!

আমি একটিমাত্র জবাব দেবো তাতেই তোমার সব কৌতূহলের সমাপ্তি ঘটবে।

বনহুর অবাক চোখে তাকিয়ে আছে হীরা মুখের দিকে।

হীরা একটু হেসে বললো–আমার বান্ধবী।

শাম্মী আপনার বান্ধবী?

হাঁ। কথাটা বলে আর একটি ফটো বের করে মেলে ধরে বনহুরের সামনে।

সঙ্গে সঙ্গে বনহুর বলে উঠে–এ ফটো আপিনি কোথায় পেলেন?

আমার বান্ধবীর আছে।

হুঁ, এবার সব বুঝতে পেরেছি।

বনহুর এবার কতটা নিশ্চিন্তভাবে আরাম কেদারায় ঠেশ দিয়ে বসলো।

হীরা পুনরায় একটি সিগারেট টিন থেকে নিয়ে তাতে অগ্নি সংযোগ করলো। তারপর কয়েকমুখ ধোঁয়া ত্যাগ করে বললো–আমার বান্ধবী মিস শাম্মী তোমাকে গভীরভাবে ভালবাসতো, যদিও তার জীবনে বহু পুরুষ এসেছে, সে কাউকে ভালবাসতে পারেনি। শুধু তার কর্তব্য পালন করে গেছে, কাউকে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেনি। শাম্মীর জীবন ছিলো বড় দুঃখের, বড় কষ্টের। অবশ্য অর্থকষ্ট বা দৈহিক কষ্ট তার ছিলো না, কষ্ট ছিলো তার মনের।

হাঁ, একথা শাম্মী আমাকে বলেছিলো।

জানি সে তার কোনো কথাই তোমার কাছে গোপন করেনি। আজ আমি তোমাকে সব বলবো বলে কথা দিয়েছি তাই আমাকে পুনরায় শাম্মী সম্বন্ধে বলতে হচ্ছে, কারণ শাম্মীর কাছেই আমি পেয়েছিলাম তোমার সন্ধান।

বনহুর অবাক চোখে তাকিয়ে দেখছে হীরার মুখ। মাঝে মাঝে তার মুখোভাব পরিবর্তন হচ্ছিলো।

হীরা বলে চলেছে– ওর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় এক উৎসবে। আমার বাবার সঙ্গে আমিও গিয়েছিলাম সেই উৎসবে। হঠাৎ ওকে আমার

খুব ভাল লেগেছিলো, তারপর থেকে সেই ভাল লাগা গভীর ভালবাসায় পরিণত হয়। প্রায়ই আমি শাম্মীর সঙ্গে মিলিত হতাম শাম্মীর এক আত্মীয়ের বাসায়। সেখানেই শাম্মী আমাকে সব বলেছিলো আর দেখিয়েছিলো তোমার ছবিটা।

থামলো হীরা, হাতের অর্ধদগ্ধ সিগারেটটা এসট্রের মধ্যে রেখে আবার বলতে শুরু করলো–জানি না ছবিটার মধ্যে কি যাদু ছিলো, আমি আত্মহারা হয়ে গেলাম। শাম্মী বলেছিলো, এ ছবিটা সে তোমার অজ্ঞাতে কোনো ফটোগ্রাফারের সহায়তায় উঠিয়ে নিয়েছিলো। আমি ঐ ছবিখানা একদিন চুরি করলাম ওর ব্যানিটি ব্যাগ থেকে। আমি যতই গোপনে ছবিটা সরিয়ে ফেলিনা কেন, সে বুঝতে পারে আমিই তার ছবিটা নিয়েছি।

আবার থামলো হীরা, মুখমণ্ডলে একটা থমথমে ভাব ফুটে উঠলো। বলে চলেছে হীরা–এরপর শাম্মী আমাকে বিষদৃষ্টিতে দেখতে লাগলো। অবশ্য সে আমার কাছে কয়েকবার ছবিটা চেয়েছিলো, আমি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছিলাম, বলেছিলাম ছবি আমি নেইনি। এই ছবির ব্যাপার নিয়ে আমাদের মধ্যে ভাঙ্গন ধরে। আমরা উভয়ে উভয়ের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই। কিন্তু আমার মনে তখন প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে উঠে। এই ছবির মানুষটাকে খুঁজতে শুরু করি। শাম্মী আমাকে সব কথা বলতে কিন্তু ঐ ছবিটা যার তার ঠিকানা কোনোদিন সে আমাকে বলেনি বা জানায়নি। অনেক সন্ধান করেও ছবির মানুষটার সন্ধান পেলাম না। তখন গুলবাগের মালিক মিঃ প্রিন্সের সহায়তায় তাকে আমি হত্যা করি।

বনহুর বিস্ময়ভরা কণ্ঠে অস্ফুট শব্দ করে উঠলো–মিস শাম্মীকে আপনি খুন করেছিলেন!

হাঁ, আমি নিজের হাতে তাকে হত্যা করি। কিন্তু মিঃ প্রিন্স তখন আমার পাশে ছিলো। শাম্মীকে তুমি যে আংটি উপহার দিয়েছিলে, সেই আংটিটা মিঃ প্রিন্সই আত্মসাৎ করে।

মিস শাম্মীর হত্যা-ব্যাপারে মিঃ প্রিন্সের কি স্বার্থ ছিলো? বরং তাকে হত্যা করে হোটেল গুলবাগ সৌন্দর্যহীন হয়ে পড়ে।

স্বার্থ তার কিছু ছিলো না। তবে আমাকে পাওয়ার আশায় সে আমাকে এ ব্যাপারে সহযোগিতা করেছিলো। কিন্তু........

কিন্তু সে আপনাকে পায়নি, এইতো?

হাঁ, আমি তাকে প্রলোভন দেখিয়ে এ ব্যাপারে আকৃষ্ট করেছিলাম।

মিঃ প্রিন্সের সঙ্গে আপনার কি করে পরিচয় ঘটেছিলো মিস হীরা?

সব বলবো লিয়ন, সব বলবো। আগে আমি যা বলছি বলে নিই।

আচ্ছা বলুন?

শাম্মীকে হত্যা করেও আমি শান্তি পেলাম না। কারণ ছবির আসল মানুষটির সন্ধান পেলাম না আমি। হাঁ, আমি একটা ভুল করেছিলাম, মিঃ প্রিন্সকে যদি আমার মনের সব কথা খুলে বলতাম বা ছবিখানা তাকে দেখাতাম তাহলে ছবির মানুষটির সন্ধান পেতাম। কারণ আমি পরে জানতে পারি, শাম্মীর কাছে যার ছবি আমি পাই সে ঐ হোটেলেই এগারো তলার পাঁচ নম্বর ক্যাবিনে থাকতো। আমি যখন জানতে পেলাম তখন তুমি সরে গেছো হোটেল গুলবাগ থেকে......

ও, আপনি তাহলে হোটেল গুলবাগে আমার সন্ধান করেছিলেন?

একবার নয়, কতবার করেছি। শুধু তোমাকে একবার দেখবো বলে কিন্তু সে আশা আমার তখন পূর্ণ হয়নি। আমি লাহোর শহর তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি। করাচীতেও এমন কোনো হোটেল নেই যে সেখানে তোমার সন্ধান করিনি। হঠাৎ তোমার দেখা পেলাম আচম্বিতে আমারই হীরাঝিলে। আমি কোনোদিন কল্পনাও করতে পারিনি আমি যার সন্ধান করে ফিরছি, সেই আমার পিতার হত্যাকারী। থামলো হীরা।

বনহুর বললো–যদি জানতেন তাহলে নিশ্চয়ই সেই হত্যাকারীকে শাস্তি দেবার জন্য উন্মাদ হয়ে উঠতেন?

না, কারণ আমার বাবার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ছিলো না।

বাবার প্রতি কন্যার শ্রদ্ধা না থাকাটা অতি বিস্ময়কর বটে।

না, সবক্ষেত্রে নয়। বাবার আচরণ যদি বাঞ্ছনীয় না হয় তাহলে আমি দুঃখ পাওয়ার চেয়ে খুশি হয়েছি বেশি, একথা অবশ্য তোমাকে পূর্বেও বলেছি। কাজেই তোমার উপর কোনো রাগ বা আক্রোশ নেই। হাঁ, যা বলবো বলে তোমাকে এখানে এনেছি এবার সেই কথা বলি।

তাই বলুন মিস হীরা। বনহুর কথাটা বলে সিগারেটের টিন থেকে একটা সিগারেট তুলে নিয়ে তাতে অগ্নি সংযোগ করলো।

আমার বাবা আর মিঃ প্রিন্স বন্ধুলোক ছিলেন। একসঙ্গে এরা কারবার করতেন বহুদিন থেকে। প্রথম প্রথম আমি মনে করতাম, আমার বাবা এবং মিঃ প্রিন্স ভাল ব্যবসাই করেন। কিন্তু একদিন জানতে পারলাম আমার বাবার ব্যবসা সৎ ব্যবসা নয়। মদ ও গাঁজার চোরা কারবার করেন তারা। আরও জানতে পারলাম বাবা মেয়েদের নিয়েও ব্যবসা করেন। মিঃ প্রিন্স তার পার্টনার। মন আমার বিদ্রোহী হয়ে উঠলো, একটা মদ, গাঁজা এবং নারী ব্যবসায়ীর কন্যা আমি! কলেজে পড়তাম, শিক্ষা কিছু পেয়েছি, কাজেই অন্যায়ে আমার মন বিষিয়ে উঠলো। আমার বাবা আমাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। ব্যবসা করে বহু টাকা তিনি উপার্জন করেছিলেন, আমার নামে তাই তিনি এই হীরাঝিল তৈরি করেন।

একটু থামলো হীরা, তারপর আবার সে বলতে শুরু করলো—আমার মা ছিলেন অতি আদর্শবতী মহিলা। বাবা কিভাবে অর্থ উপার্জন করেন তিনি জানতেন না। কিন্তু বাবা আমাকে ফাঁকি দিতে পারেননি, আমি যখন বড় হয়ে সব জানতে পারলাম তখন গোপনে সন্ধান নিতে শুরু করলাম। আমাদের বাড়ি থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে হীরাঝিল। লোকের মুখে হীরাঝিলের কাহিনী শুনতাম, বাবা কোনোদিন হীরাঝিল সম্বন্ধে আমার মাকে বা আমাকে কিছু বলতেন না, বরং বাবা আমাদের কাছে হীরাঝিল সম্বন্ধে বেশ সতর্ক থাকতেন। তবে হীরাঝিল যে আমার নামে করেছেন, একথা তিনি সবার কাছে বলতেন। হীরাঝিল সম্বন্ধে অনেক রকম কথা আমার কানে আসতো কিন্তু আসল রহস্য কি জানতাম না। হীরাঝিল সম্বন্ধে অনেক রকম কথাই শুনতাম আমি। তাই একদিন গোপনে হীরাঝিলে পৌছলাম। পুরুষের ছদ্মবেশে এলাম হীরাঝিলে। পৌছে ভালই লাগলো, বাইরে থেকে কিছু বুঝবার যো নেই। প্রথম নজরে খুশিই হলাম, বাবা আমার নামে হীরাঝিল তৈরি করে আমাকে কত ভালবাসতেন তা প্রমাণ করেছেন। অবশ্য বেশিক্ষণ এ আনন্দ আমার স্থায়ী হয়নি সেদিন। হীরাঝিলের অভ্যন্তরে যে নারকীয় দৃশ্য আমি দেখলাম তা অবর্ণনীয়।

হীরার দু'চোখে যেন আগুন ঝরে পড়লো। হয়তো সে নতুন করে সেদিনের দৃশ্য অনুভব করছে। একটু থেমে আবার শুরু করলো—দেখলাম কিভাবে আমার বাবা মদ ও গাঁজার চোরা ব্যবসা করেছেন। দেখলাম

আমার বাবা নিজে কি করে নিরীহ অসহায় বন্দী নারীদের উপর পাশবিক অত্যাচার চালাচ্ছেন। মন আমার বিদ্রোহী হয়ে উঠলো, আমি আর এক মুহূর্ত হীরঝিলে থাকতে পারলাম না। হীরাঝিলের সৌন্দর্য আমার চোখে বিষময় লাগলো, আমি পালিয়ে গেলাম যেমন গোপনে এসেছিলাম তেমনি গোপনে।

হীরার মুখমণ্ডল রক্তাভ হয়ে উঠেছে, অধর দংশন করে সে, তারপর বলে—এমন পিতার মৃত্যুতে কোন্ কন্যা খুশি না হবে বলো। তাই আমিও খুশি হয়েছি। এখন আমি চাই হীরাঝিলের সব কলঙ্ক মুছে ফেলতে। হীরঝিল হবে পবিত্র, নিষ্পাপ স্থান...

বনহুরের মুখে একটা আনন্দের আভাস ফুটে উঠলো। দীপ্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠলো তার চোখ দুটো। সে খুশিতে হীরার দক্ষিণ হাতখানা চেপে ধরলো—মিস হীরা, আপনি হীরাঝিলের সব কলঙ্ক মুছে ফেলতে চান? সত্যি, সত্যি বলছেন......

হাঁ। এসো আমার সঙ্গে, আমি আজ তোমাকে সব দেখাবো, হীরাঝিলের সব রহস্য আজ প্রকাশ করে দেবো, তারপর......

বনহুর বললো—চলুন মিস হীরা।

বনহুর উঠে দাঁড়ালো।

হীরা এগুলো আগে আগে।

একটা কক্ষের দরজায় এসে দাঁড়ালো হীরা।

তার পিছনে বনহুর।

হীরা তার জামার ভিতর থেকে বের করলো একটি চাবি।

অবাক হয়ে দেখলো বনহুর চাবিটা সম্পূর্ণ সোনার তৈরি।

হীরা চাবি দিয়ে তালাটা খুলে ফেললো।

সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেলো।

বনহুর দেখলো কক্ষের ভিতরে আরও একটি কক্ষ। সে কক্ষটাও তালাবদ্ধ।

হীরা এবার দ্বিতীয় একটি চাবি বের করলো। এ চাবিটাও সোনার তৈরি, সেই চাবি দিয়ে খুলে ফেললো দ্বিতীয় কক্ষের তালাটা।

দরজা খুলে যেতেই একটা লিফট নজরে পড়লো।

হীরা লিফটে চেপে দাঁড়িয়ে বনহুরকে সেই লিফটে চাপার জন্য ইংগিত করলো।

বনহুর হীরার নির্দেশ পালন করলো।

লিফটের বোতম টিপতেই লিফট নিচে নেমে চললো। মাত্র কয়েক সেকেন্ড, এমন একটা কক্ষে এসে লিফট থামলো, যে কক্ষটা সম্পূর্ণ লৌহ কারাগার ছাড়া কিছু না।

বনহুর আর হীরা লিফট থেকে নেমে দাঁড়ালো।

হীরা একটি সুইচ টিপে আলো জ্বালালো।

সঙ্গে সঙ্গে যে দৃশ্য বনহুরের মজরে পড়লো তা অবর্ণনীয়। এখানে সব মহিলাদের বন্দী করে রাখা হয়েছে। সবাই প্রায় অর্ধ উলঙ্গ অবস্থায় আছে। প্রায় সবাই যুবতী–ষোল থেকে ত্রিশ বছরের মধ্যে সবার বয়স হবে।

বনহুর লজ্জায় দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলো। চোখের সামনে মা-বোনদের এ অবস্থা সে সহ্য করতে পারলো না।

হীরা বুঝতে পারলো বনহুরের মনোভাব, বললো–এরা সবাই আমার বাবা এবং শয়তান মিঃ প্রিন্সের শিকার।

বনহুর বলে উঠলো–আমি জানতাম হীরাঝিলের অভ্যন্তরে এমনি নারকীয় দৃশ্যের অবতারণা অহরহ ঘটছে।

হীরা বললো–চলে, এরপর আরও দেখবে চলো।

হীরা এরপর বনহুর সহ যে কক্ষে এসে দাঁড়ালো সে কক্ষে অগণিত নারী-পুরুষকে দেয়ালে লৌহশিকলে আটকে রাখা হয়েছে। প্রত্যেকের দেহ কঙ্কালসার।

বনহুর হীরাকে জিজ্ঞাসা করলো–এদের অপরাধ?

হীরা বললো–এরা বাবার সম্বন্ধে মন্দ উক্তি উচ্চারণ করেছিলো এবং বাবার আদেশ পালনে অবাধ্য হয়েছিলো।

হুঁ। বনহুর গম্ভীরভাবে বললো।

হীরা বললো–চলো।

বনহুর হীরাকে অনুসরণ করলো।

এবার যে কক্ষের দরজায় এসে দাঁড়ালো হীরা, সে কক্ষে শুধু ছোট শিশুদের আটক করে রাখা হয়েছে। সবার বয়স অনুমান পাঁচ থেকে দশ

বছরের বেশি নয়। ফুটফুটে সুন্দর চেহারা, চোখেমুখে আভিজাত্যের ছাপ বিদ্যমান।

বনহুর বললো–এদের এখানে পৃথক রাখা হয়েছে কেন?

বিদেশে চালান দেবার জন্য এদের এখানে বাছাই করে রাখা হয়েছে। এরা সবাই বাঙ্গালীদের ছেলেমেয়ে।

হাঁ, আমি এদের চেহারা দেখেই বুঝতে পেরেছি এরা বাঙ্গালী।

এসো, আরও আছে।

চলুন।

হীরা আর বনহুর এগিয়ে যাচ্ছে।

হীরাঝিলকে বাইরে থেকে সুন্দর একটি স্বপ্নপুরী মনে হয়, তার ভিতরটা এমন জঘন্য, কেউ কল্পনা করতে পারবে না।

এবার হীরা যে কক্ষে এসে দাঁড়ালো সে কক্ষে দৃষ্টি পড়তেই বনহুর চমকে উঠলো, অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠলো–রহমান!

অবাক চোখে দেখলো বনহুর, কয়েকজন বন্দীকে মেঝেতে হাত-পা বেঁধে বুকের উপর পাথরচাপ দিয়ে চীৎ করে ফেলে রাখা হয়েছে। সামনের লোকটি রহমান। পাশে দৃষ্টি ফেলতেই দেখলো রামসিং-এর অবস্থাও তাই। আজ দু'দিন এভাবে পাথরচাপা দিয়ে ওদের রাখা হয়েছে।

এ কক্ষে যাদের এভাবে পাথরচাপা দিয়ে রাখা রয়েছে তাদের অবস্থা একেবারে কাহিল, কারো সংজ্ঞা নেই বলে মনে হচ্ছে।

বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে এগিয়ে এলো, তারপর ঝুঁকে পড়ে ডাকলো–রহমান! রহমান......

ধীরে ধীরে চোখ মেললো রহমান, বনহুরকে দেখে তার চোখ দুটো যেন দীপ্ত হয়ে উঠলো, ক্ষীণ কণ্ঠে বললো–সর্দার...পা...নি...

হীরা অবাক দৃষ্টি নিয়ে দেখছিলো, এবার বলে উঠলো–একে তুমি চেনো?

হাঁ, আমার বন্ধুলোক এরা।

বনহুর এবার রহমানের বুক থেকে পাথরখানা সরিয়ে ফেললো। তারপর রামসিং-এর বুক থকে পাথর সরিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

পাথরগুলো অত্যন্ত ভারী থাকায় বনহুরের খুব কষ্ট হলো, সমস্ত দেহ ঘামে ভিজে গেলো।

বনহুর যখন পাথরগুলো ওদের বুক থেকে সরিয়ে নিচ্ছিলো তখন হীরার দু'চোখে বিস্ময় ঝরে পড়ছে। এ পাথরগুলো কমপক্ষে চারজন বলিষ্ঠ লোক মিলে ওদের বুকের উপর রেখেছে, সেই পাথর বনহুর একা নামিয়ে নিলো!

বনহুর শুধু রহমান ও রামসিংকেই মুক্ত করলো না, সে প্রত্যেকটা বন্দীর বুক থেকে পাথর সরিয়ে ফেললো।

সবাইকে মুক্ত করে বনহুর বসে পড়লো ধপ করে একটা পাথরের উপর। মাথা বেয়ে ঘাম ঝরছে, বনহুর হাতের পিঠে ঘাম মুছে ফেললো।

হীরা নিজের রুমাল দিয়ে বনহুরকে বাতাস করতে লাগলো।

রহমান, রামসিং তখন ধীরে ধীরে উঠে বসছে।

অন্যান্য বন্দীর বুক হাল্কা হওয়ায় তারাও প্রাণ ভরে নিশ্বাস নিচ্ছে। কেউ বা উঠে বসেছে, কেউ বা পাশ ফিরে শুয়ে বুকে হাত বুলাচ্ছে।

বনহুর তাকিয়ে দেখলো ওপাশে একজন একটুও নড়ছে না। উঠে এগিয়ে গেলো, হাত দিয়ে গায়ে ঝাঁকুনি দিতেই বুঝতে পারলো তার দেহে প্রাণ নেই।

হীরাকে লক্ষ্য করে বললো বনহুর- শেষ হয়ে গেছে।

হীরার মুখ বিষণ্ন হলো, সে বললো–সব আমার বাবার কীর্তি।

বনহুর বললো–আর একদিন বিলম্ব হলে এদের সকলের অবস্থা ঐ লোকটার মত হতো। বনহুর নিজে রহমান এবং রামসিং এর বুকে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো।

রহমান বললো সর্দার, আপনি বেঁচে আছেন এটা আমরা ভাবতে পারিনি। আমরা যখন বন্দী হলাম তখন দেখেছি আপনি সেই ধূম্রপূর্ণ কক্ষটির মেঝেতে পড়ে গড়াগড়ি যাচ্ছেন......

রামসিং ক্ষুধা-পিপাসায় অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছিলো, তবু সর্দারকে জীবিত অবস্থায় দেখতে পেয়ে খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠেছিলো, বললো–সর্দার..... সর্দার......

রামসিং, তোমার বুঝি খুব কষ্ট হচ্ছে?

না সর্দার, আপনাকে পেয়ে আমার সব কষ্ট ঘুচে গেছে। আপনি বেঁচে আছেন তাই বড় আনন্দ হচ্ছে......

হীরা অবাক হয়ে শুনছিলো ওদের কথাবার্তা। এবার বললো সে-বুঝেছি, তোমরা একসঙ্গে এসেছিলে এবং একসঙ্গে ধরা পড়েছো। আরও জানি কেন তোমরা এসেছিলে?

এবার বনহুর ফিরে তাকালো হীরার মুখে-সত্যি আপনি জানেন আমরা কেন এসেছিলাম?

জানি, শাম্মীর কাছেই শুনেছিলাম পাকিস্তানে কেন তুমি এসেছো, কি তোমার উদ্দেশ্য।

তাহলে আমার উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে?

হাঁ হবে। এই নাও চাবি, সব বন্দীকে তুমি মুক্ত করে নিয়ে যাও। আমার হীরাঝিল কলঙ্ক থেকে মুক্ত হোক।

বনহুর হাত বাড়ায় হীরার দিকে।

ঠিক ঐ মুহূর্তে এককানা ছোরা এসে বিদ্ধ হয় হীরার বুকের ঠিক মাঝখানে।

একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠে হীরা।

বনহুর ওকে ধরে ফেলে।

হীরার বুকের রক্তে বনহুরের হাত দু'খানা লালে লাল হয়ে উঠে। তাকায় বনহুর সম্মুখের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়কণ্ঠে বলে উঠে-শামস হুসাইন তুমি মরোনি?

না! কথাটা জড়িতভাবে উচ্চারণ করলো শামস হুসাইন। বনহুর দেখলো শামস হুসাইনের দু' চিবুক বেয়ে তখনও তাজা রক্ত গড়িয়ে পড়ছে, বুকের কাছে জামাটা রক্তে লালে লাল হয়ে গেছে। মাতালের মত টলছে শামস হুসাইন।

বনহুর বুঝতে পারলো শামস হুসাইন তখন মরেনি। সংজ্ঞা হারিয়ে ছিলো মাত্র। ছোরাখানা শামস হুসাইনই হীরাকে লক্ষ্য করে মেরেছে। বনহুর বিলম্ব না করে হীরার বুক থেকে ছোরাখানা তুলে নেয় আলগোছে।

হীরা যন্ত্রণায় বুক চেপে ধরে।

বনহুর হীরাকে শুইয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

আমি দৃষ্টি নিয়ে তাকায় শামস হুসাইনের মুখের দিকে। দাঁতে দাঁত পিষে বলে–তখন মরলে বেঁচে যেতিস... এখন আবার মর তবে... বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরে বনহুর শামস হুসাইনের গলাটা, তারপর সজোরে ছোরাখানা বসিয়ে দেয় ওর বুকে।

শামস হুসাইনের মুখ থেকে এতো বেশি রক্তপাত হয়েছিলো যার জন্য ওর দেহে কোনো শক্তি ছিলো না। বনহুর যখন ওর গলাটা চেপে ধরলো তখন দেহটা ওর মাতালের মত দুলছিলো। ছোরাবিদ্ধ শামস হুসাইন লুটিয়ে পড়লো ভূতলে। একটা তীব্র গোঁ গোঁ আওয়াজ বেরিয়ে এলো শামস হুসাইনের মুখ থেকে।

বনহুর আপন মনেই বলে উঠলো–এবার আর দাঁড়াতে পারবি না শয়তান! ছুটে গেলো বনহুর হীরার পাশে, যত্ন সহকারে ওর মাথাটা তুলে নিলো কোলের উপর। ডাকলো –মিস হীরা....

ধীরে ধীরে চোখ মেললো হীরা, জড়িত কণ্ঠে বললো– শামস হুসাইন.... আমাকে..... বাঁচতে.... দিলো.....না....আমার হীরা.... ঝিল.....

বলুন? বলুন মিস হীরা? বনহুর ব্যাকুল কণ্ঠে শুনতে চাইলো হীরার শেষ কথাগুলো।

রহমান, রামসিং এরা বিস্ময় বিমূঢ়ভাবে তাকিয়ে আছে। কারো মুখে কোনো কথা নেই, সবাই হতবুদ্ধি হয়ে গেছে যেন।

হীরার চোখ দুটো বন্ধ হয়ে আসছে, তবু সে চেষ্টা করছে চোখ দু'টোকে মেলে রাখতে। বললো আবার সে.....হীরা.... ঝিলের......বন্দী......দের.....তুমি মুক্ত করে......দিও.......

দেবো। দেবো হীরা.... বলো, বলো হীরা আর কি বলতে চাও?

বনহুর আপন মনেই হীরাকে তুমি বলে সম্বোধন করে বসলো।

হীরা হাত তুলে একদিকে দেখিয়ে বললো...ওই....ওই দিকে....গোপন....দরজা .... আছে......ঐ ....দিকে.....যা....

কথা শেষ করতে পারলো না হীরা, মাথাটা ওর একপাশে কাৎ হয়ে পড়লো।

বনহুরের মুখমণ্ডল বেদনায় করুণ হয়ে উঠলো, বললো– রহমান, এই মেয়েটি আমাকে রক্ষা করেছিলো যার জন্য আমি তোমাদের রক্ষা করতে পারলাম। কিন্তু আফসোস, ওকে রক্ষা করতে পারলাম না....

একটু থেমে নিজেকে সংযত করে নিলো–তারপর হীরার মাথাটা কোল থেকে নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ালো–বললো, বনহুর–হীরা আমাকে পথের সন্ধান দিয়ে গেলো। ঐদিকে কোনো গোপন দরজা আছে, সেই দরজাপথে বন্দীদের উদ্ধার করতে হবে।

হীরাঝিলের সব বন্দী উদ্ধার পেয়েছে। পাকিস্তানের অন্যান্য বন্দীশালায় এখনও কিছু বাঙ্গালী আটক আছে বটে, কিন্তু তাদেরও আমি দু'দিনে মুক্ত করে নেবো। এখন বাকি নাসিমাকে বাংলাদেশে পৌঁছে দেওয়া। কথাগুলো বলে থামলো বনহুর।

রহমান, রামসিং, কাওসার, হারুন এরা সবাই মনোযোগ সহকারে শুনছিলো তাদের সর্দারের কথাগুলো। রহমান বললো এবার-সর্দার, প্রায় বছর হয়ে এলো আমরা কান্দাই ছেড়ে এসেছি, মন আমাদের অস্থির হয়ে গেছে।

রামসিং বলে উঠলো–হাঁ সর্দার, এবার আমরা আস্তানায় ফিরে যেতে চাই।

বনহুর একটু হেসে বললো–শুধু কি তোমাদেরই মন দেশে ফেরার জন্য অস্থির হয়েছে? আমার মনে কি কিছু হচ্ছে না? আমারও মন আর এদেশে টিকছেনা, রহমান?

বলুন সর্দার?

আগামী সপ্তাহে কান্দাই অভিমুখে রওয়ানা দেবো ভেবে নিয়েছি, তার পূর্বে নাসিমাকে বাংলাদেশে তার বাবার কাছে পৌঁছে দিয়ে এসো।

নাসিমা তখন ওপাশে আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনছিলো, চোখ দুটো তার ছলছল করে উঠলো।

শুনতে পেলো পুনরায় বনহুরের কণ্ঠ–আর শোন, নাসিমা যাবার সময় ওর সঙ্গে কিছু অর্থ নিয়ে যাবে, কারণ ওর বাবা এখন সম্পূর্ণ অসহায় বেকার অবস্থা। ওদের যেন বাংলাদেশে কোনো কষ্ট না হয়, তার ব্যবস্থা করে দিয়ে আসবে।

আচ্ছা সর্দার, আপনার নির্দেশমতই কাজ হবে। কথাটা বললো রহমান।

এবার বনহুর কাওসারকে লক্ষ্য করে বললো–তুমি ইরানের দু'খানা টিকটি সংগ্রহ করবে। পরশুর প্লেনেই যেন রহমান নাসিমাসহ রওয়ানা দিতে পারে। আর রামসিং, তুমি দুখানা গাড়ি প্রস্তুত রাখবে, আজ রাতে সাগাই বন্দীশিবির থেকে সব বন্দীকে উদ্ধার করবো।

হারুন চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলো, বনহুর এবার তাকে লক্ষ্য করে বললো–তুমি বাঘাকে নিয়ে এখানেই থাকবে, কারণ গোপন সুড়ঙ্গ কুঠরি থেকে সব সম্পদ আজ এখানে এসে পড়বে। এই সম্পদ আমি এক সপ্তাহের মধ্যে পাকিস্তানের সমস্ত অসহায় দীন-দুঃখীর মধ্যে বিতরণ করে দেবো।

অদূরে বাঘা বসে ছিলো।

বনহুর উঠে গিয়ে বাঘার মাথায় হাত বুলিয়ে বললো–বাঘা, তুই এখানে থাকবি। দেখিস, কেউ যেন আসতে না পারে।

বাঘা লেজ নেড়ে সম্মতি জানালো। বারবার সে তাকাতে লাগলো বনহুরের মুখের দিকে। বনহুর ওকে আদর করে উঠে পড়লো।

ততক্ষণে রহমান ও অন্যান্য সকলে বেরিয়ে গেছে সেই কক্ষ থেকে। বনহুর এসে দাঁড়ায় ওপাশের ভাঙ্গা জানালাটার পাশে। ঐ জানালা দিয়ে তাকায় সে সীমাহীন আকাশের দিকে। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেছে কান্দাই এর কথা, তার মা কতদিন তাকে দেখেনি। হয়তো তিনি কত ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, না জানি কত কাঁদাকাটা করছেন। মনিরা, নূর, এরা কেমন আছে কে জানে। নূরী কেমন আছে, জাভেদ হয়তো এতোদিনে বেশবড় হয়ে গেছে। তাকে হয়তো চিনতেই পারবে না। ধীরে ধীরে মনের পর্দায় ভেসে উঠলো অগণিত অসহায় কান্দাইবাসীদের মুখ। তারা কতোদিন বনহুরের সাহায্য থেকে বঞ্চিত আছে। কে জানে, তারা কেমন আছে সবাই....

বনহুরের চিন্তাজাল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

নাসিমা এসে দাঁড়ায় তার পাশে।

বনহুর ফিরে তাকায়, ওর মুখে মুখ পড়তেই দেখতে পায়, নাসিমার রক্তাভ গণ্ড আরও রক্তাভ হয়ে উঠেছে। চোখ দুটো নত করে দাঁড়িয়ে আছে সে।

বনহুর বললো–মিস নাসিমা!

নাসিমা চোখ তুলে তাকালো।

বনহুর দেখলো নাসিমার চোখ দুটো লাল হয়ে উঠেছে।

বললো বনহুর–আপনি কেঁদেছেন?

নাসিমা নীরব।

বনহুর ওর মুখখানা উঁচু করে ধরলো–মিস নাসিমা?

বলুন?

আপনি কেন কেঁদেছেন বলুন তো?

আমি সর্বহারা, সে কথাটা আজ বেশি করে মনে পড়ছে–তাই।

শুধু আপনি নন, বাংলাদেশের শত শত মা-বোন আজ সর্বহারা, নিঃস্ব, এমন কি তাদের পরম সম্পদ ইজ্জতটাও তারা হারিয়েছে। মিস নাসিমা, আপনার বাবা আছেন। আপনি নিজে এখনও পবিত্র, নিস্কলঙ্ক আছেন, এর চেয়ে ভাগ্যবতী নারী কে আছে, বিশেষ করে বাঙ্গালী হয়ে পাকিস্তানে? তবে হাঁ, এখনও পাকিস্তানের বুকে কিছু কিছু বাঙ্গালী আছেন, যাদের প্রতি তেমন কোনো আচরণ করা হয়নি। কিন্তু তারা নানা অসুবিধায় আছেন, এ কথা সত্য। একটু থেমে বললো বনহুর-মিস নাসিমা, আপনার জন্য সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে....

নাসিমা কোনো কথা বললো না, বেরিয়ে গেলো সে মাথা নিচু করে।

বনহুর মৃদু হাসলো।

একটু পরেই দেখলো নাসিমা আবার ফিরে এলো। তার চোখে মুখে প্রফুল্ল ভাব। বনহুরকে লক্ষ্য করে বললো–বেশ আমি যাবো কিন্তু আপনাকে যেতে হবে আমার সঙ্গে, তবেই যাবো। বলুন, কথা দিন যাবেন আমার সঙ্গে?

আমি গেলে যদি খুশি হন তাহালে বেশ তাই হবে।

পরদিনই কাওসার এসে হাজির হলো বনহুর বললো–প্লেনের টিকিট পেয়েছো?

হ্যাঁ সর্দার! পকেট থেকে দু'খানা টিকিট বের করে বললো–রহমানের কাছে দেবো?

আমাকেই দাও, আমিই ওকে পৌঁছে দিয়ে আসবো।

নাসিমা আর বনহুর পাশাপাশি আসনে বসে আছে। বনহুর একটা পত্রিকা পড়ছিলো।

প্লেনখানা তখন লাহোরের আকাশ অতিক্রম করে চলেছে।

নাসিমা পাশের শার্সীপথে তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে। খণ্ড খণ্ড মেঘগুলো তাদের পাশ কেটে চলে যাচ্ছে। সাদা সাদা মেঘের উপর সূর্যের আলোকরশ্মি বড় সুন্দর লাগছিলো। মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছিলো নাসিমা, ঠিক ঐ সময় বনহুর পত্রিকাখানা রেখে নাসিমার দিকে ফিরে তাকায়, একটু হেসে বলে– কি দেখছেন?

নাসিমা বলে উঠে–দেখুন কি সুন্দর দৃশ্য!

হাঁ, বড় সুন্দর।

নাসিমা আর বনহুর যখন কথাবার্তা চলছিলো তখন পিছন আসন থেকে দু'জন লোক লক্ষ্য করছিলো তাদের দু'জনকে।

এরা দু'জনই পাকিস্তানী গোয়েন্দা বিভাগের লোক। বনহুর আর নাসিমাকে অনুসরণ করেই এই দু' গোয়েন্দা এই প্লেনে উঠেছে। ওরা ফাংহা বিমানবন্দরে পুলিশ মহলে ওয়্যারলেসে সংবাদ পাঠিয়ে দিয়েছে দু'জন বাঙ্গালী পাকিস্তান থেকে পালিয়ে যাচ্ছে, তাদের ফাংহা বিমান বন্দরে গ্রেপ্তার করা হবে।

বনহুর আর নাসিমা নিশ্চিন্ত মনে বসে আছে।

প্লেন একসময় ফাংহা বিমান বন্দরের আকাশে পৌঁছে গেলো। ফাংহা বন্দরে ত্রিশ মিনিট প্লেন অপেক্ষা করার পর আবার আকাশে উড়বে।

বনহুর বললো–মিস নাসিমা, ফাংহা বিমান বন্দরটা বড় সুন্দর।

হাঁ, আমিও বাবার মুখে শুনেছিলাম, এমন ভাবে দেখার সৌভাগ্য হবে জানতাম না।

অল্পক্ষণেই ফাংহা বিমান বন্দরে প্লেনখানা অবতরণ করলো।

বনহুর সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলো, পুলিশ তাকে ফলো করছে। এবং তাকে এই মুহূর্তে গ্রেপ্তার করবে।

নাসিমা তখন প্লেনের জানা পথে বন্দরের সৌন্দর্য উপভোগ করছিলো। ফাংহার যাত্রীরা নেমে পড়ছিলো প্লেন থেকে। নাসিমার বড় ইচ্ছা হচ্ছিলো একবার ফাংহা বন্দরে সে অবতরণ করে।

কিন্তু সে কিছু বুঝবার পূর্বেই কিছু সংখ্যক পুলিশ প্লেনখানাকে ঘেরাও করে ফেলে, কয়েকজন সশস্ত্র পুলিশ প্লেনে উঠে বনহুর আর নাসিমা খানকে ঘিরে দাড়ায়।

বনহুর এবং নাসিমা বুঝতে পারে।

নাসিমার মুখমণ্ডল বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে উঠে।

বনহুর একবার তাকিয়ে দেখে নেয়, পুলিশ বাহিনীও তাদের হাতের আগ্নেয় অস্ত্রগুলির দিকে।

ফাংহা পুলিশ সুপার স্বয়ং উপস্থিত হয়েছেন। তিনি সবার আগে বনহুরের বুক লক্ষ্য করে রিভলভার উঁচু করে ধরে।

বনহুর ভ্রুকুঞ্চিত করে তাকায়; ফাংহা পুলিশ সুপারের মুখের দিকে।

পুলিশ সুপার তার অস্ত্র ঠিক রেখে বলে–আপনারা দু'জন বন্দী হয়েছেন। খবরদার আসন ত্যাগ করতে চেষ্টা করবেননা।

বনহুর আসনে বসেই বলে–কি কারণে আপনারা আমাদের বন্দী করলেন?

পুলিশ সুপার কঠিন কণ্ঠে বললেন–পুলিশ অফিসে পৌছে সব শুনতে পারবেন।

বনহুর একবার নাসিমার মুখে দৃষ্টি বুলিয়ে নিলো। ভীষণ ঘাবড়ে গেছে নাসিমা, মুখ চোখে একটা ভীতিভাব ফুটে উঠেছে তার। বনহুর কোন কথা না বলে চুপ করে বসে রইলেন।

ফাংহা পুলিশ বাহিনী, বনহুর আর নাসিমাকে গ্রেপ্তার করে ফেললো। প্লেন থেকে নামিয়ে নেওয়া হলো তাদেরকে। পুলিশ ভ্যান একটি নয়, সাত খানা পুলিশ ভ্যান অপেক্ষা করছিলো। মাঝের পুলিশ ভ্যানে বনহুর আর নাসিমাকে তুলে নিলো ওরা।

বনহুর হঠাৎ এ বিপদে মোটেই ঘাবড়ে গেলোনা, সে জানতো এমন একটা ঘটনা ঘটতে পারে।

নাসিমা প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে পড়েছিলেন কিন্তু বনহুরের মুখের দিকে তাকিয়ে সে কতকটা আশ্বস্ত হয়। এ মুখে সে কোন রকম ভাবের পরিবর্তন লক্ষ্য করেনা।

পুলিশ ভ্যানগুলি ফাংহা বিমান বন্দর ত্যাগ করে বেরিয়ে এলো বাইরের রাজপথে। উঁচুনীচু আঁকা বাঁকা পথ। কারণ ফাংহা শহরটা প্রায় পাহাড়িয়া জায়গা। মাঝে মাঝে পথের দুপাশে বিরাট খাদ।

পুলিশ ভ্যান গুলি অতি সাবধানতার সঙ্গে এগুচ্ছিলো; বনহুর তাকিয়ে ছিলো ভ্যানের বাইরে কিন্তু মন ছিলো তার গভীর চিন্তায় মগ্ন নিজের জন্য তার কোন চিন্তা নাই কারণ সে যে কোন উপায়ে উদ্ধার পেতে পারে। ভাবনা যত নাসিমাকে নিয়ে।

যেমন করে হোক নাসিমাকে তার রক্ষা করতেই হবে।

বনহুর আনমনে তাকিয়ে আছে ভ্যানের বাইরে।

নাসিমা তাকিয়ে দেখছে ও মুখে নেই কোন ভাবান্তর, নেই কোন দুঃশ্চিন্তার ছাপ।

ভ্যান সাতখানার মাঝের খানায় বনহুর আর নাসিমাকে ওরা বন্দী অবস্থায় তুলে নিয়েছে। যদিও বনহুর এবং নাসিমার হাতে কোন হাত কড়া লাগায় নাই।

নাসিমা ফাংহা শহরের সৌন্দর্য উপভোগ করছিল। এতো বিপদেও ভালই লাগছিলো তার ফাংহার সৌন্দর্য। শুষ্ক মরুভূমির মধ্যে উচ্চপর্বতমালা। তারই গা বেয়ে আঁকা বাঁকা প্রশস্ত পথগুলো সরিসৃপের মত চলে গেচে ক্রমান্বয়ে নিচের দিকে।

ফাংহা বিমান বন্দরটা ঠিক পর্বতমালার দক্ষিণাংশে।

যেখানে আশে পাশে শুধু বিস্তৃত প্রান্তর। বিমান অবতরণে যেন কোন অসুবিধা না হয়, সে জন্য অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করে বন্দরটি তৈয়ারি করা হয়েছে।

বনহুর আর নাসিমাকে নিয়ে পুলিশ ভ্যান গুলি বিমান বন্দরে ছেড়ে বহু দূরে এগিয়ে এসেছে। এখন যে পথ বেয়ে গাড়িগুলো এগুচ্ছিল সে পথ বড় দুর্গম বড় ভয়ঙ্কর।

একপাশে সুউচ্চ পর্বতমালা, অপর পাশে বিরাট খাদ।

বনহুর ভাবছে , কি ভাবছে সেই জানে।

দু'হাত দু'পা তার মুক্ত।

কিন্তু দু'পাশে দু'জন রাইফেলধারী পাহারাদার। পিছনে এবং সম্মুখে মিলে চারজন রাইফেল ধারী তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে বসে আছে।

বনহুর আর নাসিমার ভ্যানের আগে এবং পিছনে তিনটে করে পুলিশ ভ্যান।

গাড়িগুলো ঠিক লাইন করে এগিয়ে যাচ্ছে।

বেশ কিছুক্ষণ উঁচুনীচু পথে হোচট খেয়ে খেয়ে গাড়িগুলো এগুলো। হঠাৎ এক সময় সম্মুখের গাড়িখানার একটি চাকা ভীষণ শব্দ করে থেমে গেলো।

সঙ্গে সঙ্গে গাড়িখানা হুমড়ি খেয়ে থেমে গেলো।

পিছনের গাড়িগুলোও থামতে বাধ্য হলো।

বনহুর সেই মুহূর্তটিকে অবহেলা করলো না, পাশের পুলিশ অফিসারটির চোয়ালে বজ্র এক মুষ্টিঘাত লাগিয়ে তার হাত থেকে এক ঝটকায় রাইফেল কেড়ে নিয়ে পিছন বাট দিয়ে এক এক জনকে আঘাত করে চললো।

এতো দ্রুত কাজ করলো বনহুর যে, অন্যান্য গাড়ির পুলিশ বাহিনী কিছু যেন বুঝে উঠতে পারলো না। সম্মুখে গাড়িখানার হঠাৎ কি হলো, গাড়িগুলো আচমকা থামলো কেনো এটাই তারা ভাবছিলো। ঠিক ঐ সময় বনহুর সুযোগ নিলো।

বনহুর যখন ক্ষিপ্রগতিতে পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করে চললো, তখন অন্যান্য গাড়ি থেকে পুলিশ গুলি ছুড়তে পারছে না। কারণ গুলি লক্ষভ্রষ্ট হয়ে পুলিশ অফিসারদের দেহে বিদ্ধ হতে পারে।

যে জায়গায় গাড়িগুলো সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে পড়েছিল সে জায়গা অতি সংকীর্ণ অপ্রশস্ত। পর্বতের গা বেয়ে সরু পথ। কাজেই অন্যান্য গাড়ি থেকে সবাই এক সঙ্গে নেমে আসবে তারও কোন উপায় ছিলো না।

বনহুর তার গাড়ির পুলিশ অফিসার এবং পুলিশদের অল্পক্ষণেই কাহিল করে ফেললো। নিহতও হলো কয়েকজন।

ততক্ষণে অন্যান্য গাড়ির পুলিশ বাহিনী, গাড়ি থেকে নেমে গাড়ির পাশ কেটে অতি সাবধানে বনহুরের গাড়ির দিকে এগুচ্ছে।

তারা রাইফেলের মুখ আকাশের দিকে তুলে ফাঁকা ফায়ার করে চলেছে,. যেন বন্দী পালাতে ভয় পায়।

বনহুর কালবিলম্ব না করে, নাসিমাকে তুলে নিলো দু'হাতের উপর, তারপর লাফিয়ে পড়লো সে গাড়ি থেকে নিচে গভীর খাদের মধ্যে।

❑

খুব চোট লেগেছে তোমার না? নাসিমাকে প্রশ্ন করলো বনহুর।

নাসিমা বনহুরের কোলে মাথা রেখে শুয়েছিল কারণ বনহুর যখন নাসিমাকে তুলে নিয়ে আচমকা গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়েছিল তখন সে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছিল। প্রায় এক ঘন্টা পর তার জ্ঞান ফিরে এসেছে।

বনহুর যখন গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ে তখন সে জানতো হয় মৃত্যু নয় জীবন, যা হয় একটা হবে। তবু পাকিস্তানীদের হাতে বন্দী হবে না এবং নাসিমাকে তুলে দেবে না। আর এও জানতো পাহাড়ের বড় বড় খাদের মধ্যে নরম মাটিও থাকে।

বনহুর যা ভেবেছিল তাই হয়েছে।

লাফিয়ে পড়ার পর সে অনুভব করলো পায়ের নিচে তার কোমল মাটি। খোদাকে স্মরণ করে সে লাফ দিয়েছিলো, তাই হয়ত খোদার রহমে সে বেঁচে গেলো এ যাত্রা। বনহুর তাই প্রথমে খোদাকে হাজার হাজার ধন্যবাদ জানিয়ে নিলো।

তবে বাম পায়ে কিছুটা চোট লেগে ছিলো বনহুরের অল্পক্ষণেই সে সামনে নিয়েছিলো, অমন আঘাত সে জীবনে বহু পেয়েছে। কাজেই ব্যথা তার কাছে তেমন কিছু নয়। তার দুঃচিন্তা হয়েছিল নাসিমাকে নিয়ে। তারপর নাসিমার যখন সংজ্ঞা ফিরে এলো, তখন বনহুর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিলো। যা হোক নাসিমার জীবনটাও তা হলে রক্ষা পেয়েছে।

বনহুর আবার প্রশ্ন করলো–মিস নাসিমা আপনি এখন কেমন বোধ করছেন?

ভালই আছি। কথাটা বলে সে তাকালো চারিদিকে, বললো নাসিমা আমরা এখন কোথায়?

বললো বনহুর–ফাংহার পর্বতমালার কোন এক গহ্বরে।

নাসিমার মনে পড়ে সব কথা। ....পুলিশ ভ্যানে তারা ছিল। হঠাৎ সম্মুখে একটা শব্দ, আচমকা গাড়িগুলো থেমে গেলো, সঙ্গে সঙ্গে বনহুর পাশের পুলিশটার মুখে চোখে মুষ্টিঘাত শুরু করলো। তারপর শুরু হলো প্রচণ্ড লড়াই, তারপর আচমকা বনহুর তাকে হাতের উপর তুলে নিয়ে পাশের গভীর খাদের মধ্যে ঝাপিয়ে পড়লো। পর পর কয়েকটা গুলির শব্দ কানে এসেছিলো কিন্তু আর কিছু মনে নেই.....,নাসিমা বললো–চারি দিকে এতো অন্ধকার লাগছে কেনো?

গভীর খাদের মধ্যে আলো কোথায় পাবেন বলুন? এখন আপনি কোন রকম অসুস্থ বোধ করছেন না তো?

না। উঠে বসতে যায় নাসিমা।

বনহুর বলে–না, আপনি উঠবেন না। যেমন আছেন তেমন শুয়ে থাকুন।

আপনার কোথাও আঘাত লাগেনি তো?

না, খোদা আমাকে রক্ষা করেছেন। সবচেয়ে আমি বেশি খুশি হয়েছি আপনি সুস্থ আছেন সে জন্য।

নাসিমা বললো তখন–সত্যি আপনার কত দয়া।

আমার নয়, সব সেই দয়াময়ের দয়া। বললো বনহুর। একটু থেমে বললো আবার–মিস নাসিমা এই অন্ধকারময় গহ্বরে আমাদের কতক্ষণ কাটাতে হবে কে জানে।

নাসিমা উঠে বসে বললো–অন্ধকারে আমার কেমন লাগছে।

বনহুর শান্ত,গম্ভীর কণ্ঠে বললো–আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন মিস নাসিমা। এখানে আমাদের জন্য অন্ধকারই শ্রেয়।

কিন্তু......
বলুন?
আপনার বড্ড ক্ষুধা পেয়েছে।
আমার জন্য এতো ভাবছেন কেনো। বরং আপনার বড্ড ক্ষুধা পেয়েছে জানি।
মেয়েরা অনেক কিছু সহ্য করতে পারে।
এতো বিপদেও নাসিমার মনে তার জন্য কত চিন্তা। যে ক'দিন সাগাই পোড়াবাড়িতে তারা ছিলো, নাসিমা তার জন্য নিজের হাতে রোজ খাবার তৈরি করেছে। নিজে না খেয়ে পরিবেশন করে খাইয়েছে। আজ নাসিমার কথায় সেই দিনগুলি বনহুরের চোখের সম্মুখে ভেসে উঠলো। বললো বনহুর–নাসিমা বাঙ্গালী মেয়েদের দুটো জিনিস আমাকে মুগ্ধ করে সে দুটো হলো একটি তাদের সেবা আর একটি হলো সতীত্ব বোধ।
নাসিমা বলে–এ দু'টো যেন নারী জাতির শ্রেষ্ঠ ধর্ম।
হাঁ সে কথা মিথ্যা নয় মিস নাসিমা। কারণ আমি দেখছি আমার মা; আমার স্ত্রীর মধ্যে এমনি এক দীপ্ত প্রতিভার বিকাশ।
অন্ধকার না হলে বনহুর নাসিমার মুখ ভাব লক্ষ্য করে বিস্মিত হতো। বনহুর যখন তার স্ত্রীর কথা তুললো তখন আচমকা ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছিলো ওর মুখ।
বনহুর বললো–মিস নাসিমা?
বলুন?
হঠাৎ চুপ করে গেলেন কেন?
না কিছু না।
কোন অসুবিধা হচ্ছে আপনার?
না।
তবে?
বললাম তো কিছু না।
মিস নাসিমা আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, বলেছি আপনার কোন......
বলুন থামলেন কেনো?
কোন ভয় নেই।
ভয়! আপনি পাশে থাকতে ভয়। ভয়কে আমি জয় করেছি......

বাইরেও অন্ধকার হয়ে আসছে বোধ হয়, সন্ধ্যা হয়ে এলো রাতটা এই গুহার মধ্যেই কাটাতে হবে।

এটা গুহা?

হাঁ। পর্বতমালার কোন একটা গুহা।

এখানে এলাম কি করে?

আপনাকে সহ খাদটির মধ্যে লাফিয়ে পড়ার পর সেখান থেকে সরে আসি, কারণ ওরা কোন ক্রমে আমাদের দেখে ফেললে, যেমন করে হোক খাদ থেকে উঠিয়ে পাকড়াও করবে, তাতে কোনো কোন সন্দেহ ছিলো না।

এতোক্ষণে নাসিমা বুঝতে পারে বনহুর তার সংজ্ঞাহীন দেহটা নিয়ে এই গুহায় আত্মগোপন করেছে। এটা কোন খাদ নয়, একটি গুহা এবং গুহাটি পর্বত্র মালার প্রায় তল দেশে তাতে কোন ভুল নেই। কারণ আকাশটার কিঞ্চিৎ দেখা যাচ্ছে মাথার উপরে বহু দূরে। ঐ ফাঁকটার দিকে তাকিয়েই বনহুর বললো এখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে।

বনহুর বললো–রাতটা এখানে কাটিয়ে কাল সকালে এখান থেকে বের হবার চেষ্টা নিতে হবে।

বেশ কিছুক্ষণ উভয়ে চুপ চাপ।

হাজার হলেও নাসিমা নারী, এমন নির্জন অন্ধকারময় গুহায় একটি পুরুষের সঙ্গে রাত কাটানো কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছিলো সে। কিন্তু কোন উপায় নাই।

বনহুর বললো–জায়গাটা ভিজে বা স্যাঁত স্যাঁতে নয়, কাজেই আমাদের রাত কাটানো তেমন কোন অসুবিধা হবে না। মিস নাসিমা আপনি শুয়ে পড়ুন।

আর আপনি?

আমিও ঘুমাবো। বনহুর নিজে বড় ক্লান্ত বোধ করছিলো। কাজেই সে শুয়ে পড়লো হাতের উপর মাথা রেখে।

নাসিমা যেমন বলেছিলো তেমন বসে রইলো।

বনহুর নাসিমার পাশ থেকে কিছুদূরে শুয়ে ছিলো। তাকিয়ে বললো–আপনি কি শুয়েছেন?

নাসিমা বললো–না।

কেনো?

নাসিমা কোন জবাব দিলোনা।

বনহুর বললো আবার–শুয়ে পড়ুন।

না আমি বসেই রাত কাটিয়ে দেবো, বললো নাসিমা।

বনহুর একটু হেসে বললো–বুঝেছি আপনার কষ্ট হচ্ছে। এমনভাবে কোনদিন মাটির মধ্যে ঘুমাননি তো?

বনহুর নিজের শরীর থেকে জামাটা খুলে নাসিমার দিকে ছুড়ে দিয়ে বললো–এটা বিছিয়ে শুয়ে পড়ুন।

নাসিমা জামাটা তুলে নিলো হাতে, একটা অনাবিল আনন্দ তার মনকে দীপ্ত করে তুললো। খুশি হলো সে অনেক।

একটু পরে জিজ্ঞাসা করলো বনহুর–শুয়েছেন আপনি?

হাঁ শুয়েছি।

এবার ঘুমিয়ে পড়ুন।

বনহুরের ঘুম ভেংগে গেলো।

চোখ মেলে তাকালো সে। ভোর হয়ে গেছে। উপরের সেই ফাঁক দিয়ে ভোরের আলোক রশ্মি এসে গুহা মধ্যে আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে।

বনহুর দেখলো নাসিমা অঘোরে ঘুমাচ্ছে।

হঠাৎ চমকে উঠলো, তার শরীরের উপর তারই জামাটা সে কখন বিছিয়ে দিয়ে গিয়েছে, কিছুই জানেনা বনহুর।

একটু হাসির রেখা ফুটে উঠলো বনহুরের ঠোঁটের কোণে, কি যেন ভাবলো সে, নাসিমার মুখের দিকে তাকিয়ে তারপর উঠে দাঁড়ালো। জামাটা পরে নিলো গায়ে। এবার সে তাকিয়ে দেখলো কোন রকমে বাইরে বের হওয়া যায় কিনা। তার যেমন ক্ষুধা পেয়েছে তেমনি ক্ষুধা পেয়েছে নাসিমার। সুন্দর মুখখানা ওর বড় মলিন করুণ দেখাচ্ছে।

বনহুর পাথর বেয়ে উপরে উঠতে লাগলো।

যদিও তার কষ্ট হচ্ছিলো, তবু সে, প্রাণপন চেষ্টায় এক সময় উঠে এলো উপরে। প্রায় দেড়শত গজ নিচে ঘুমিয়ে আছে নাসিমা।

পাথর খন্ডের উপর দাঁড়িয়ে তাকালো চারিদিকে কোথাও কোন জন মানব নাই। অদূরে পাথরের গা বেয়ে যে পথটা চলে গেছে সেই পথও এখন জনহীন নির্জন। কাল ঐ পথ দিয়েই সাতখানা পুলিশ ভ্যান তাকে আর নাসিমাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাচ্ছিলো। ভাগ্যিস পাশে তেমনি একটি গভীর

খাদ ছিলো, না হলে বড় মুস্কিল হতো বিশেষ করে নাসিমাকে নিয়ে বিপদে পড়তো সে। বনহুর এবার নিজের জামাটা খুলে ফেললো এবং ছিড়ে ফেললো এখানে সেখানে। পরনের প্যান্টটাও হাটু অবধি গুটিয়ে নিলো। চুলগুলো আংগুল দিয়ে এলো মেলো করে ফেললো।

চোখে মুখে ধূলো বালি লাগিয়ে ঠিক একটি শ্রমিক সেজে নিলো বনহুর। তারপর চলতে লাগলো শহর অভিমুখে।

কিছুদূরে এগুতেই দেখতে পেলো কতকগুলো শ্রমিক, এক জায়গায় পাথর কেটে কেটে স্তূপাকার করছে এবং কতকগুলো শ্রমিক ঝুড়ি বোঝাই করে ট্রাকে তুলছে।

বনহুর আরও এগুতে লাগলো।

নিকটবর্তী হতেই চমকে উঠলো, দেখলো একজন বৃদ্ধ পাথর কাঁধে গাড়িতে তুলতে যাচ্ছিলো কিন্তু তার দেহে বল না থাকায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো, সঙ্গে সঙ্গে একজন পাহারাদার তার চাবুক দিয়ে ভীষণ ভাবে আঘাত করতে লাগলো।

বৃদ্ধ লোকটা মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি দিতে লাগলো।

বনহুর স্তব্ধ হয়ে দেখছে কি নির্মম দৃশ।

নিরীহ গরীবদের প্রতি কি নিদারুন অত্যাচার।

বনহুর ভালভাবে লক্ষ্য করেই বুঝতে পারলো সেখানে যারা শ্রমিকের কাজ করছে তারা সবাই অত্যন্ত গরিব শ্রেণীর লোক আর কতকগুলো লোক তাদের তদারক করে চলেছে, তাদের প্রত্যেকের হাতেই বেত বা চাবুক আছে। যার কাজে একটু দুর্বলতা প্রকাশ পাচ্ছে তাকেই ওরা আঘাতের পর আঘাত করে চলেছে।

বনহুর কিছুক্ষণ স্থির ভাবে দেখলো। তার ধমনির রক্ত উষ্ণ হয়ে উঠলো। দুচোখে আগুন ঠিকরে বের হলো অধর দংশন করলো সে আপনা আপনি। তারপর এগুলো বনহুর শ্রমিকগণ যেখানে কাজ করছে সেখানে এসে দাঁড়ালো।

বনহুরকে দেখে এগিয়ে এলো এক পাহারাদার। হাতের চাবুক গাছা দোলাতে দোলাতে বললো–কি হে কাজ করবে নাকি?

বনহুর স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো–হাঁ।

তবে এসো এদের সঙ্গে যোগ দিয়ে কাজ করো। পয়সা পাবে। কথাগুলো বললো পাহারাদারটি।

বনহুর বললো—কত পয়সা দেবেন তাতো বললেন না?

এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা করে আমরা দেই। যে ভাল কাজ করে সে কিছু বখশীস পায় আর যে ভাল কাজ করতে না পারে তার মজুরীর মধ্য থেকে কিছু কাটা যায়।

বনহুর ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললো আর আপনাদের চাবুকের ঘা হয় তাদের পাওনা।

হাঁ তা ঠিক বলেছো। ঐ দেখো একজন কাজ করতে অক্ষম তাই তাকে পেটানো হচ্ছে। পাহারাদারটি আংগুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দিলো।

বনহুর দেখলো একজন শ্রমিককে নির্মমভাবে প্রহার করে চলেছে। ভ্রুকুঞ্চিত হলো বনহুরের।

পাহারাদারটি বললো—কি কাজ করবে?

হাঁ করবো। জবাব দিলো বনহুর।

চলো তবে কাজ শুরু করো।

বলুন।

বনহুর পাহারাদরটিকে অনুসরণ করলো।

প্রথম দিন কাজ শেষ করে এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা পেলো। পয়সা নিয়ে সে একটি দোকান থেকে কিছু রুটিমাংস নিলো তারপর ফিরে চললো সে যেখানে রয়েছে নাসিমা খান।

❑

ওদিকে নাসিমার ঘুম ভেঙ্গে গেলে চারিদিকে তাকিয়ে দেখে, কেউ নেই, সে গেলো কোথায়। বুকটা ধক্ ধক্ করে উঠে এক অজানা আশঙ্কায়। একটা দারুণ অবিশ্বাসের ছায়া পড়ে তার মনে, ওর মনে এতো চক্রান্ত ছিলো। তাকে এখানে একা ফেলে সে চলে গেছে। যাবার সময় একটি কথাও সে বলে গেলোনা। নাসিমা দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। কিছুক্ষণ নীরবে কাঁদলো সে তারপর হঠাৎ মনে পড়েলো, হয়তো

সে আপন ইচ্ছায় যায়নি, তাকে কেউ জোর করে নিয়ে গেছে কিংবা কোন হিংস্র জীবজন্তু ভক্ষণ করেছে। নাসিমা আঁচলে চোখের পানি মুছে গুহাটার মধ্যে দেখতে লাগলো। দিনের আলোতে কিছু কিছু দেখা যাচ্ছিলো বটে।

অনেক চেষ্টা করে কোন রকম রক্তের দাগ বা সন্দেহ জনক কিছু নজরে পড়লোনা। নাসিমার মন ক্রমেই চঞ্চল হয়ে উঠছে। একে ক্ষুধা পিপাসায় সে অত্যন্ত কাতর।

ভাবে নাসিমা ও তাকে এ গুহায় রেখে পালিয়ে গেছে। আর কোনদিন ফিরে আসবেনা। নাসিমা এই অন্ধকারময় গুহায় তিল তিল করে শুকিয়ে মরবে। কোনদিনই সে এ গুহা থেকে বেরুতে পারবেনা।

সমস্ত দিনটা কেটে যায় তবু ফিরে আসেনা বনহুর। ডুকরে কাঁদতে ইচ্ছা করে ওর কিন্তু কেঁদে কি হবে। চারিদিকে শুধু পাষাণ প্রাচীর, চিৎকার করলেও কেউ শুনতে পাবেনা।

তুব নাসিমা চিৎকার করে ডাকতে লাগলো—কে কোথায় আছো আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও......কে...কোথায় আছো আমাকে বাঁচাও......

প্রতিধ্বনি ফিরে এলো কিন্তু কারো সাড়া এলোনা।

উপরের ঐ ফাঁকটুকুর দিকে তাকিয়ে আকাশ দেখতে পাচ্ছে। ঐ ফাঁকটুকুই এখন যেন তার ভরসা। ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে আসছে, বেশ বুঝতে পারছে আকাশটা ধীরে ধীরে অন্ধকার হয়ে এলো ভিতরটাও জমাট অন্ধকারে ভরে উঠেছে ক্রমান্বয়ে।

কাল সে ছিলো, আজ সে একা। এই নির্জন গুহায় কি করে তার রাত কাটবে।

হঠাৎ নাসিমার দু'চোখে আলোর বন্যা ছড়িয়ে পড়লো। কে যেন উপর থেকে গুহার মধ্যে আলো ফেলছে। নাসিমা—ভীত জড়োসড় হয়ে গুহার এক পাশে আশ্রয় নিলো, ভাল ভাবে লক্ষ্য করে বুঝতে পারলো, সেটা মশালের আলো। কেউ যেন মশাল নিয়ে নিচে নেমে আসছে।

প্রথমে ভয় পেলেও , অল্পক্ষণ পরেই নাসিমা দেখতে পেলো, ও আসছে। পাথর বেয়ে বেয়ে ধীরে ধীরে নামছে বনহুর। দাঁত দিয়ে একটা পুটলী ধরে আছে, বাম হাতে একটি জ্বলন্ত মশাল। ডান হাতে পাথর এটে ধরে ধরে নামছে।

বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলো। বনহুরকে ফিরে আসতে দেখে দু'চোখে তার আনন্দ ছড়িয়ে পড়েছিলো।

বনহুর যতক্ষণ পর্যন্ত কষ্ট করে নামছিলো ততক্ষণ নাসিমা কিংকর্তব্য বিমূঢ়ের মত তাকিয়েছিলো তার দিকে।

বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টা করার পর নিচে নেমে এলো বনহুর। জ্বলন্ত মশালটা একটা ফাটলে গুজে রেখে ফিরে তাকালো নাসিমার দিকে।

নাসিমার দু'চোখে আনন্দ দৃতি খেলে যাচ্ছে।

বনহুর বললো–নাসিমা এই নাও তোমার জন্য খাবার এনেছি।

নাসিমা এতোক্ষণে খুশির উচ্ছ্বাসে বনহুরের চেহারাটা ভালভাবে লক্ষ্য করেনি এবার ওর সমস্ত শরীরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললো–আপনার একি চেহারা হয়েছে?

একটু হেসে বললো বনহুর–আজ নতুন দেখছেন বলে অবাক হচ্ছেন। এরপর রোজ দেখবেন......থাক সে সব পরে হবে এখন এগুলো খেয়ে নিন তো? বনহুর জামার মধ্যে থেকে খাবারগুলো বের করে নাসিমার দিকে বাড়িয়ে ধরলো–নিন।

নাসিমা হাত বাড়িয়ে নিয়ে গুহার মেঝেতে বসলো। তারপর বললো–আপনিও খেয়ে নিন।

হাঁ আমিও খাবো। সত্যি বড্ড ক্ষুধা পেয়েছে। বনহুর নিজেও খেতে শুরু করলো।

নাসিমা লক্ষ্য করলো অন্যান্য খাবারের চেয়ে সে ফলগুলোই শুধু খাচ্ছে। খাওয়া শেষ করে বললো–নিন ফল খেয়ে নিন।

আপনি শুধু ফল খেলেন–রুটি মাংস খাবে না?

না, ওগুলো আপনার জন্যই এনেছিলাম।

তা হয়না আপনিও খান।

হুঁ। মাত্র দেড় টাকা রোজগার করে ছিলাম, তাই দিয়ে সামান্য রুটি মাংস এনেছি ওটুকু আপনি খান।

আমি অনেক খেলাম।

আমিও অনেক খেলাম মিস নাসিমা।

ফল খেয়ে পেট ভরে কখনও?

আমার ভরে।

আপনাকেও রুটি মাংস খেতে হবে। নাসিমা এবার রুটি আর মাংস খানিকটা ছিঁড়ে নিয়ে বনহুরের মুখের কাছে তুলে ধরে বলে–নিন্–হা করুন দেখি।

বনহুর অবাক চোখে তাকালো নাসিমার মুখের দিকে, মনে পড়লো মনিরার মুখখানা, এমনি করে সে তাকে খেতে না চাইলেও খাইয়ে দিতো। বনহুর এবার কোন রকম আপত্তি না করে খেতে শুরু করলো।

মশালটা তখনও দপদপ করে জ্বলছে।

নাসিমা বললো–ভাগ্যিস মশালটা এনেছিলেন, না হলে নামতেন কি করে? একটু থেমে বললো আবার নাসিমা, কি যে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। সত্যি বলুন তো আমাকে না বলে অমন করে চলে গিয়েছিলেন কেনো।

বললে হয়তো আমাকে যেতে দিতেন না কিংবা নিজেও আমার সঙ্গে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়তেন।

সে কথা মিথ্যা নয়, মোটেই আমি আপনাকে একা যেতে দিতাম না।

তাহলে আমি ঠিকই করেছিলাম।

আচ্ছা আমরা দু'জনা কি এক সঙ্গে বেরুতে পারবোনা কতদিন এখানে থাকতে হবে?

মিস নাসিমা ভেবেছিলাম দু'একদিন এখানে আত্মগোপন করে থাকতে হবে–কিন্তু তা হলোনা।

কেনো?

ফাংহার নিরীহ মানুষদের প্রতি ফাংহা সরকারের নির্মম আচরণ আমার ধমনির রক্তে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। আজ যেখানে আমি কাজ করে এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা পেয়েছি–সেখানেই দেখেছি ফাংহার আসল রূপ। ......কি করে মানুষ হয়ে মানুষ পিটে মারে......

মশালের আলোতে নাসিমা দেখলো বনহুরের চোখ মুখে এক অদ্ভুত দীপ্তভাব।

নাসিমা বলে–এরাতো আপনার দেশের মানুষ নয়, এদের জন্য আপনার এতো দরদ কেনো?

হঠাৎ হেসে উঠে বনহুর।

নাসিমা অবাক চোখে তাকায় তার মুখে।

বনহুরের হাসির শব্দে নিস্তব্ধ গুহা মধ্যে প্রতিধ্বনি বাজে। নাসিমার দু'চোখে বিস্ময় ঝরে পড়ে কারণ ওকে সে এমন করে হাসতে দেখেনি কোনদিন।

বনহুর হাসি থামিয়ে বলে–মিস নাসিমা সমস্ত পৃথিবীর মানুষ আমার কাছে এক।

না, আমি ঠিক্ তা বলছি না।

বলছি এরা তো বাঙালী নয়!

আবার আপনি ভুল করছেন মিস নাসিমা। কারণ মানুষ সবাই মানুষ। বাঙ্গালী, বিহারী, খ্রিষ্টান, নিগ্রো, সবাই মানুষ পাকিস্তানীদের প্রতি আমার কোন আক্রোশ নাই, কারণ এরা সবাই অপরাধী নয়। আমি চাই যে দোষ করবে সেই শাস্তি পাবে। একটু থেমে আবার বললো বনহুর–বাংলাদেশে যে সব অবাঙ্গালী আছে, আমি চাইনা বিনা দোষে তাদের উপর অত্যাচার চলুক। আমি চাইনা পাকিস্তানে যে বাঙালী আছে, তাদের প্রতিও এরা অবিচার করুক। আমি চাইনা–আমি মানিনা, আমি সহ্য করতে পারিনা, কোন অন্যায়, অনাচার, অবিচার......

নাসিমা বিস্ময়ভরা চোখে তাকিয়ে আছে ওর মুখখানার দিকে। মশালের আলোত অদ্ভুত লাগছে ওকে। কঠিন দীপ্ত সুন্দর মুখ দু'চোখে যেন আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে। দাঁতে দাঁত পিষে বললো বনহুর–সব আমি সহ্য করতে পারি কিন্তু মানুষ হয়ে মানুষের প্রতি অবিচার করবে এ আমি সহ্য করতে পারি না। সে যে জাতীয় মানুষই হোক।

ওর কথাগুলো যেন নাসিমার হৃদয় স্পর্শ করছিল। এমন পুরুষ সে দেখেনি কোনদিন, তাই সে হতবাক হয়ে শুনতে থাকে ওর কথাগুলো।

ক্রমান্বয়ে মশালের আলো নিভে আসে।

বনহুর বলে–এবার শুয়ে পড়ুন মিস নাসিমা। রাত অনেক হয়েছে। হাই তোলে বনহুর, কারণ সে আজ অত্যন্ত পরিশ্রম করেছে।

নাসিমা বললো–আপনিও শুয়ে পড়ুন।

হাঁ আমিও শোব। মিস নাসিমা আর কিছুদিন আপনাকে কষ্ট করতে

তাতে আমার দুঃখ নাই। শুধু ভয় হয় আপনার যদি কোন বিপদ ঘটে তাহলে.....

তাহলে এই অন্ধকারময় গুহায় আপনি একা অসহায় কি করবেন এই তো?

মরতে আমার ভয় নেই। এ গুহায় তিল তিল করে শুকিয়ে মরবো তবু আপনাকে মরতে দিতে চাই না। আপনি মানুষ নন, একটি দীপ্তময় প্রতিভা। আপনাকে হারালে পৃথিবী এক মহামূল্য সম্পদ হারাবে, তাতে কোন সন্দেহ নাই। আপনি......

হঠাৎ নাসিমার চোখ দু'টো ওদিকে অন্ধকারে চলে যায়, চিৎকার করে উঠে নাসিমা।

বনহুর সবেমাত্র শুয়ে পড়েছিলো, লাফ দিয়ে উঠে বসে অকায় যেদিকে তাকিয়ে নাসিমা চিৎকার করে উঠেছিলো, দেখতে পায় দুটি চর্টের আলো ওদিকের ফাটলের মধ্যে জ্বলজ্বল করে জ্বলছে।

নাসিমা ভয়াতুরভাবে এগিয়ে গিয়ে বনহুরের বুকে মুখ লুকায়, দেহখানা তার থর থর করে কাঁপছে।

টর্চের আলো দু'টো যেন এগিয়ে আসছে ধীরে ধীরে।

বনহুর নাসিমাকে নিবিড় করে আঁকড়ে ধরলো। ভুলে গেলো নাসিমা তার কেউ নয়, সে কথা।